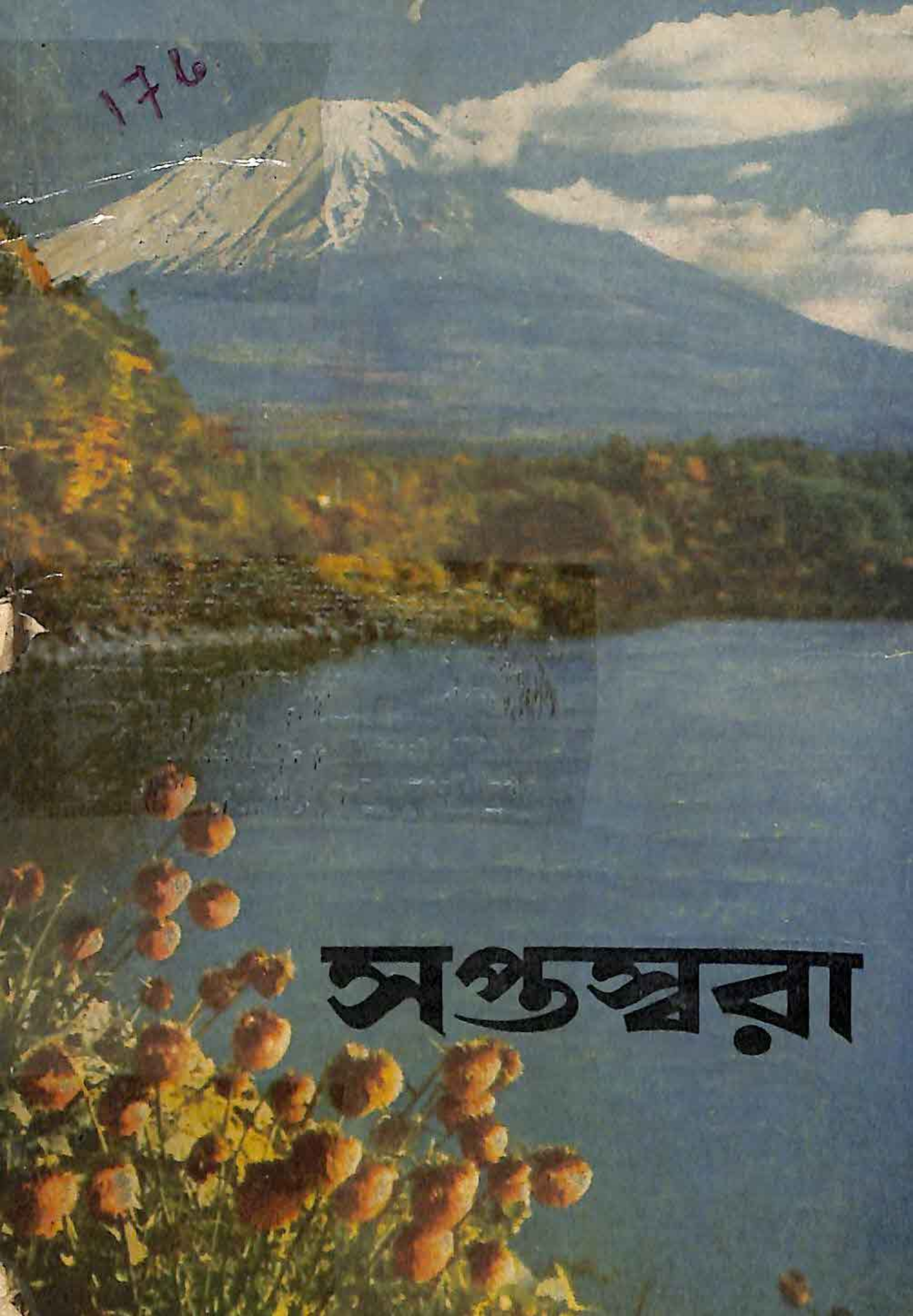

176
সপ্তস্বরা

Approved by the West Bengal Board of Secondary
Education as a Text-Book for Class VII
Vide Notification No. TB/76/7/VII/127 Dated 24. 12. 76.

সপ্তস্বরা

সপ্তম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য

পরিমার্জিত এবং পরিশিষ্টাংশে নতুন সংযোজিত

অধ্যাপক অম্বরীষ রাহা, এম. এ., বি. টি.

বীর বিক্রম সান্ধ্য (ত্রিপুরা সরকার) কলেজের (বাংলা বিভাগ)
প্রাক্তন অধ্যাপক, শ্যামবাজার হাই স্কুলের (উচ্চ মাধ্যমিক)
প্রাক্তন শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক
এবং
বর্তমানে রানাঘাট (গভঃ স্পনসর্ড) কলেজের
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

ডিসেম্বর
১৯৮৩
৩

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪ ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
টা. ৩'৭০

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

দুই বিলাসীর গল্প

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর



ধর্মপুরে গোবিন্দ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। তন্মধ্যে একজন ভোজনবিলাসী; অর্থাৎ, অন্নে ও ব্যঞ্জনে যদি কোনও দোষ থাকিত, তাহা দুর্জ্ঞেয় হইলেও, ঐ অন্নের ও ঐ ব্যঞ্জনের ভক্ষণে তাহার প্রবৃত্তি হইত না; দ্বিতীয় শয্যাবিলাসী, অর্থাৎ, শয্যায় কোনও দুর্লক্ষ্য বিঘ্ন ঘটিলেও, সে তাহাতে শয়ন করিতে পারিত না। ফলতঃ এই এক এক বিষয়ে তাহাদের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তদীয় ঈদৃশ বিস্ময়জনক ক্ষমতার বিষয় তত্রত্য নরপতির কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাহাদের ঐ ক্ষমতার পরীক্ষার্থে, সাতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন, এবং উভয়কে রাজধানীতে আনাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা কে কোন বিষয়ে বিলাসী।

অনন্তর, তাহারা স্ব স্ব পরিচয় দিলে, রাজা, প্রথমতঃ ভোজনবিলাসীর পরীক্ষার্থে, পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া, নানাবিধ সুরস অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। পাচক, রাজকীয় আজ্ঞা অনুসারে, সাতিশয় যত্ন সহকারে, চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া, ভূপতিসমীপে সংবাদ দিল। রাজা ভোজনবিলাসীকে আহার করিবার আদেশ করিলে, সে আহারস্থানে উপস্থিত হইল; এবং আসনে উপবেশনমাত্র, গাত্রোত্থান করিয়া, নৃপতি সমীপে প্রতিগমন করিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করিয়াছ। সে কহিল, না মহারাজ! আমার ভোজন করা হয় নাই। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, কেন। সে

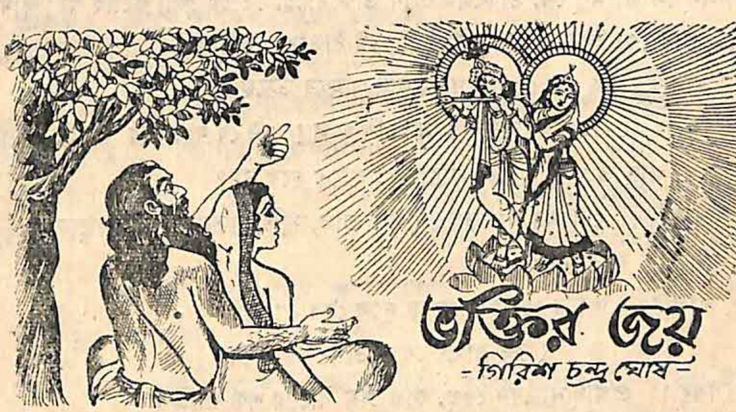
কহিল, মহারাজ! অন্নে শবগন্ধ নির্গত হইতেছে ; বোধ করি, শ্মশান সন্নিহিত-ক্ষেত্রজাত ধান্যের তণ্ডুল পাক করিয়াছিল। রাজা শুনিয়া, তদীয় বাক্য উন্মত্ত-প্রলাপবৎ অসঙ্গত বোধ করিয়া, কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন ; এবং এই ব্যাপার গোপনে রাখিয়া, ভাণ্ডারীকে ডাকাইয়া, সেই তণ্ডুলের বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে ভাণ্ডারী, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, নরপতিগোচরে আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! অমুক গ্রামের শ্মশান সন্নিহিত-ক্ষেত্রজাত ধান্যে ঐ তণ্ডুল প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজা শুনিয়া নিরতিশয় চমৎকৃত হইলেন, এবং ভোজনবিলাসীর সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, তুমি যথার্থ ভোজনবিলাসী।

অনন্তর, রাজা, এক সুসজ্জিত শয়নাগারে দুগ্ধফেননিভ পরম রমণীয় শয্যা প্রস্তুত করাইয়া শয্যাবিলাসীকে শয়ন করিতে আদেশ দিলেন। সে, কিয়ৎক্ষণ শয়ন করিয়া, নৃপতিসমীপে আসিয়া, নিবেদন করিল, মহারাজ! ঐ শয্যার সপ্তম তলে এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত আছে; তাহা আমার সাতিশয় ক্লেশকর হইতে লাগিল ; এজন্য শয়ন করিতে পারিলাম না। রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন ; এবং শয়নাগারে প্রবেশ পূর্বক, অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পাইলেন, শয্যার সপ্তমতলে যথার্থ ই এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত রহিয়াছে। তখন, তিনি, যৎপরোনাস্তি সন্তোষ প্রদর্শনপূর্বক, বারংবার তাহার প্রশংসা করিয়া কহিলেন, তুমি যথার্থ শয্যাবিলাসী। অনন্তর, তাহাদের দুই সহোদরকে, যথোচিত পারিতোষিক প্রদানপূর্বক, পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। দুইজন বিলাসীর গল্প সংক্ষেপে নিজ ভাষায় লিখ।
২। ক) ভোজনবিলাসী কেন ভোজন করিতে পারিল না?
 খ) শয্যাবিলাসীর কি অভিযোগ ছিল?
৩। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—
 ক) শয্যায় কোনও — বিঘ্ন ঘটিলেও।
 খ) 'চর্ব্য, চূষ্য, —, পেয়, চতুর্বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য।
 গ) শ্মশান সন্নিহিত ক্ষেত্রজাত ধান্যের — পাক করিয়াছিল।
 ঘ) ঐ শয্যার — তলে এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত আছে।
৪। শব্দার্থ লিখ ঃ—
 দুর্জ্ঞেয়, সন্নিহিত, দুগ্ধফেননিভ।

ভোজনবিলাসী ও শয্যাবিলাসী দুই বা[illegible]



ভক্তির জয়

-গিরিশ চন্দ্র ঘোষ-

॥ প্রান্তর মধ্যস্থ শুষ্ক অশ্বত্থতল ॥

(বিদূষক ও ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

বিদূ। বাম্‌নি—বাম্‌নি, এইখানটায় আয়। ডাইনীর ভয়ে এখানটায় মধুর নাম কিছু কম হয়।

ব্রাহ্মণী। ও মা, এই ডাইনিখেগো গাছ-তলাটায় বস্‌ব কি গো ?

বিদূ। আরে ডাইনিখেগো নয় রে, ডাইনিখেগো নয়, এইখানে পাণ্ডবের শিবির ছিল ; বোধ হয় শ্রীমধুসূদন মাঝে মাঝে এর তলায় এসে ব'সতেন।

ব্রাহ্মণী। হ্যাঁগা, তুমি দিনরাত কৃষ্ণ নিন্দা কর কেন বলত ?

বিদূ। বুঝতে পারি নে। তোর মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি নেই বলে।

ব্রাহ্মণী। হ্যাঁগা, চোখে কাপড় বেঁধে ব'সলে কেন ?

বিদূ। বঙ্কিম নয়নের জ্বালায়।

ব্রাহ্মণী। বঙ্কিম নয়ন কি ?

বিদূ। ত্রিভঙ্গিম ঠাম, বঙ্কিম নয়ন, মুরলী বয়ান !

ব্রাহ্মণী। ওঃ হরি তোমায় দেখা দেবার জন্যে অম্‌নি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বাহাত্তুরে ধরেছে।

বিদূ। আরে থাম্ থাম্। ও নাম করিস নে, ও নাম করিস নে ! ওরে

জানিস্ নে জানিস্ নে, ডাকলেই এসে উঁকি মারে, তোরে কৃপা কল্লেই বা আমায় বেঁধে দেয় কে, আমায় কৃপা কল্লেই বা তুই দাঁড়াস কোথা?

ব্রাহ্মণী। ও গো দেখ দেখ, গাছটা গজিয়ে উঠছে।

বিদু। তোর কথা আমি শুনে চোখ খুলি! ঐ যে মধুর রব এখান অবধি আসছে, গাছ ত গাছ, গাছের বাবাকে গজাতে হবে না?

ব্রাহ্মণী। চোখের কাপড়ই খোলনা ছাই, সত্যি নূতন পাতা গজাচ্ছে!

বিদু। সত্যি না কি?

ব্রাহ্মণী। আরে চোখের কাপড় খুলে দেখ না ছাই।

(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

বিদু। ও বামনি, দেখ্ দেখ্, কার যেন পায়ের শব্দ পাচ্ছি।

ব্রাহ্মণী। ও একজন বুড়ো বামুন।

বিদু। ভয় দেখা—ভয় দেখা, সরে পড়ুক। নিদেন দু'বার গাছতলায় ব'সে হাই তুলে নাম ক'রবে।

শ্রীকৃষ্ণ। আপনি কে ম'শায়?

বিদু। আপনি কে, আগে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

বিদু। আর আমি অন্ধ কন্ধকাটা।

শ্রীকৃষ্ণ। ম'শায়, যদি কৃপা ক'রে আমায় কিছু খেতে দেন।

বিদু। শুন্‌ছি তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বুড়ো হ'লে, তবু একটু আক্কেল হ'ল না! শুনছ না, কার নাম ক'রে ঐ বেজায় গর্জন উঠ্‌ছে! ঠাকুর স্বয়ং পুরে, যদি ভালা-ই চাও, নদী থেকে দু' আঁজলা জল খেয়ে পগার পার হও। নইলে বৈকুণ্ঠের হাত থেকে শিবের বাবা তোমায় ছাড়াতে পারবে না।

শ্রীকৃষ্ণ। আহা, বৈকুণ্ঠে যেতে কার অসাধ বল! তুমি যেতে চাও না?

বিদু। একদম না।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন?

বিদু। তোমার মতন অত শৌখিন নই।

শ্রীকৃষ্ণ। চোখে কাপড় বেঁধেছেন কেন ?

বিদূ। চোখের ব্যামো হ'য়েছে।

ব্রাহ্মণী। ও গো ঠাকুর, পাছে শ্রীকৃষ্ণ এসে দেখা দিয়ে ওকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়, সেই ভয়ে চোখে কাপড় বেঁধে আছে। ক্ষেপেছে গো ক্ষেপেছে !

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা ঠাকুর, যদি হরি এসে তোমার সামনে দাঁড়ায়, তা হ'লে তুমি কি কর ?

বিদূ। গুটি গুটি গে রথে চড়ি, আর কি করি !

শ্রীকৃষ্ণ। আর হরি যদি এসে থাকে ?

বিদূ। কই—কোন্ দিকে ! বাম্‌নি, চোখে কাপড় দে—চোখে কাপড় দে।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, সত্যই আমি একবার ডাক্‌লে থাকতে পারি নে।

বিদূ। তবে এসেছ ?

ব্রাহ্মণী। না গো না, ও একজন বুড়ো বামুন।

বিদূ। বাম্‌নি, বুঝিস্ নে, ও কখন বুড়ো, কখন ছোঁড়া, তার কিছু ঠিকানা নেই।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, তুমি আমায় ভয় কর কেন !

বিদূ। যখন এসে দাঁড়িয়েছ, সে সব ত চুকে গিয়েছে। কিন্তু সাফ বল্‌ছি, যেথায় নিয়ে যাও, তুমি যে চাবুক হাতে ক'রে, কি শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধ'রে এসে সামনে দাঁড়াবে, আমি তাতে চোখ খুল্‌ছি নি ! যদি দেখা দেবে,—বাঁশি ধ'রে, সামনে দাঁড়াও, আমি চোখের কাপড় খুলছি।

শ্রীকৃষ্ণ। ঠাকুর, আমি ব্রজ ছাড়া অনেক দিন, সে রূপ কি ক'রে ধ'রব ?

বিদূ। চেপে যাও না, যে না জানে, তার কাছে ভিরকুটি ক'রো। ভাবছ বুঝি বোকা বামুন খবর রাখে না ? খবর না রাখ্‌লে তোমায় অত ভয় করতেম না।

শ্রীকৃষ্ণ। দ্বিজোত্তম, তোমার অসীম ভক্তি ; দেখ, তোমার পাদস্পর্শে আমার অশ্বথ দেহ পল্লবিত হয়েছে ! তুমি ধন্য, তোমার বিশ্বাস ধন্য !

বিদূ। ধন্য ধন্যই তো ক'চ্ছ, যা বল্লুম, তা কর না, তা নইলে আমি চোখ খুলছি নে কালাচাঁদ! মুরলীধর হও তো হও, নইলে সোজা পথ আছে—চ'লে যাও।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, দেখ।

(রাধাকৃষ্ণ মূর্তির আবির্ভাব)

বিদূ। ওরে বাম্‌নি, দেখ দেখ দেখ। এখন গোলোকেই যাই, আর বৈকুণ্ঠেই যাই, আর দুঃখ নাই।

উভয়ে। জয় রাধারঞ্জন!

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। বিদূষক কি ধরনের ভক্ত ছিলেন? তাঁহার ভক্তির জয় হইল কি প্রকারে? সে কাহিনী নিজ ভাষায় লিপিবদ্ধ কর।

২। ক) 'ওগো দেখ দেখ, গাছটা গজিয়ে উঠছে।'—কোন্ গাছ? গাছটা গজাইয়া উঠিতেছে—ইহার অর্থ কি? গাছটি কেন গজাইয়া উঠিতেছে?

খ) 'ও কখন বুড়ো, কখন ছোঁড়া, তার কিছু ঠিকানা নেই।'—কাহার সম্পর্কে কে এই কথা বলিতেছে? এই কথার অর্থ কি?

৩। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :—

ক) বৈকুণ্ঠের হাত থেকে……পারবে না।
খ) সত্যিই আমি……থাকতে পারি নে।
গ) দ্বিজোত্তম তোমার……পল্লবিত হয়েছে।

৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

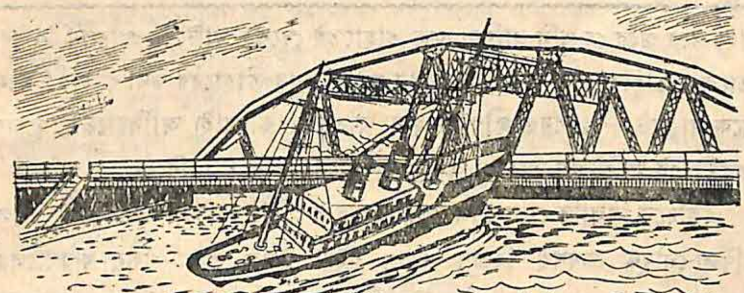
ক) ডাইনীর ভয়ে এখানটায়—নাম কিছু কম হয়।
খ) গাছের—গজাতে হবে না!
গ) এখন গোলোকেই যাই, আর—যাই, আর দুঃখ নাই।

৫। ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর :—

ক) তোরে কৃপা কল্লেই বা আমি দাঁড়াই কোথা, আমায় কৃপা কল্লেই বা তোকে বেঁধে দেয় কে?
খ) বৈকুণ্ঠে যেতে কার সাধ বল?
গ) বাঁশি ধ'রে, সামনে দাঁড়াও, আমি চোখের কাপড় খুলছি না।

৬। অর্থ লিখ :—খাড়ু, উপদেবতা, কন্ধকাটা, বৈকুণ্ঠ, ভালাই, মুরলীধর।

অন্তরে শুদ্ধ ভক্তি থাকলেই ভগবানের
দর্শন মেলে - নাটকে সে এই সত্য



জাহাজের খোল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাগজে কী একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া একদিন মধ্যাহ্নে জ্যোতিদাদা নিলামে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে, তিনি সাত হাজার টাকা দিয়া একটা জাহাজের খোল কিনিয়াছেন। এখন ইহার উপরে এঞ্জিন জুড়িয়া কামরা তৈরি করিয়া একটা পুরা জাহাজ নির্মাণ করিতে হইবে।

দেশের লোকেরা কলম চালায়, রসনা চালায় কিন্তু জাহাজ চালায় না, বোধ করি এই ক্ষোভ তাঁহার মনে ছিল। দেশে দেশালাইকাঠি জ্বালাইবার জন্য তিনি একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশালাই কাঠি অনেক ঘর্ষণেও জ্বলে নাই; দেশে তাঁতের কল চালাইবার জন্যও তাঁহার উৎসাহ ছিল কিন্তু সেই তাঁতের কল একটিমাত্র গামছা প্রসব করিয়া তাহার পর হইতে স্তব্ধ হইয়া আছে। তাহার পরে স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ চালাইবার জন্য তিনি হঠাৎ একটা শূন্য খোল কিনিলেন, সে-খোল একদা ভরতি হইয়া উঠিল শুধু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নহে —ঋণে এবং সর্বনাশে। কিন্তু তবু এ কথা মনে রাখিতে হইবে, এই-সকল চেষ্টায় ক্ষতি যাহা সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাবি অধ্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারম্বার নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন; সে বন্যা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায় কিন্তু

তাহা স্তরে স্তরে যে-পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে—তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকে না বটে, কিন্তু সমস্ত জীবন যাঁহারা ক্ষতিবহন করিয়াই আসিয়াছেন, মৃত্যুর পরবর্তী এই ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।

একদিকে বিলাতি কোম্পানি আর একদিকে তিনি একলা—এই দুই পক্ষে বাণিজ্য-নৌযুদ্ধ ক্রমশই কিরূপ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল তাহা খুলনা-বরিশালের লোকেরা এখনো বোধ করি স্মরণ করিতে পারিবেন। প্রতিযোগিতার তাড়নায় জাহাজের পর জাহাজ তৈরি হইল। ক্ষতির পর ক্ষতি বাড়িতে লাগিল, এবং আয়ের অঙ্ক ক্রমশই ক্ষীণ হইতে হইতে টিকিটের মূল্যের উপসর্গটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল—বরিশাল-খুলনার স্টিমার লাইনে সত্যযুগ আবির্ভাবের উপক্রম হইল। যাত্রীরা যে কেবল বিনা ভাড়ায় যাতায়াত শুরু করিল তাহা নহে, তাহারা বিনা মূল্যে মিষ্টান্ন খাইতে আরম্ভ করিল। ইহার উপরে বরিশালের ভলান্টিয়ারের দল স্বদেশী কীর্তন গাহিয়া কোমর বাঁধিয়া যাত্রীসংগ্রহে লাগিয়া গেল, সুতরাং জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না কিন্তু আর সকলপ্রকার অভাবই বাড়িল বই কমিল না। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে স্বদেশ হিতৈষিতার উৎসাহ প্রবেশ করিবার পথ পায় না; কীর্তন যতই জমুক, উত্তেজনা যতই বাড়ুক গণিত আপনার নামতা ভুলিতে পারিল না —সুতরাং তিন-ত্রিক্‌খে নয় ঠিক তালে তালে ফড়িঙের মতো লাফ দিতে দিতে ঋণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অব্যবসায়ী ভাবুক মানুষের একটা কুগ্রহ এই যে, লোকেরা তাঁহাদিগকে অতি সহজেই চিনিতে পারে কিন্তু তাঁহারা লোক চিনিতে পারেন না, অথচ তাঁহারা যে চেনেন না এইটুকুমাত্র শিখিতে তাঁহাদের বিস্তর খরচ এবং ততোধিক বিলম্ব হয় এবং সেই শিক্ষা কাজে লাগানো তাঁহাদের দ্বারা ইহজীবনেও ঘটে না। যাত্রীরা যখন বিনা মূল্যে মিষ্টান্ন খাইতেছিল তখন জ্যোতিদাদার কর্মচারীরা যে তপস্বীর মতো উপবাস করিতেছিল, এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই; অতএব যাত্রীদের জন্যও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, কর্মচারীরাও বঞ্চিত হয় নাই, কিন্তু সকলের-চেয়ে মহত্তম লাভ রহিল জ্যোতিদাদার—সে তাঁহার এই সর্বস্ব-ক্ষতিস্বীকার।

তখন খুলনা-বরিশালের নদীপথে প্রতিদিনের এই জয়-পরাজয়ের সংবাদ-আলোচনায় আমাদের উত্তেজনার অন্ত ছিল না। অবশেষে একদিন খবর আসিল, তাঁহার 'স্বদেশী' নামক জাহাজ হাবড়ার ব্রিজে ঠেকিয়া ডুবিয়াছে। এই রূপে যখন তিনি তাঁহার নিজের সাধ্যের সীমা একেবারে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিলেন, নিজের পক্ষে কিছুই আর বাকী রাখিলেন না, তখনই তাঁহার ব্যবসায় বন্ধ হইয়া গেল।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। ক) জ্যোতিদাদার জাহাজের খোল কিনিবার পিছনে কি উদ্দেশ্য ছিল?
   খ) প্রতিযোগিতা করিয়া জাহাজ চালাইতে গিয়া তাঁহাকে কি কি করিতে হইয়াছিল?
   গ) পরিণতিতে জাহাজ ও জাহাজের মালিকের কি হইল?

২। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর ঃ—
   ক) দেশের লোকেরা……জাহাজ চালায় না।
   খ) সে খোল একদা……এবং সর্বনাশে।
   গ) সে বন্যা হঠাৎ……প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে।
   ঘ) গণিত আপনার……পারিল না।
   ঙ) সকলের চেয়ে……সর্বস্ব ক্ষতিস্বীকার।
   চ) নিজের পক্ষে……রাখিলেন না।

৩। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—
   ক) — জুড়িয়া কামরা তৈরি করিয়া একটা পূরা জাহাজ নির্মাণ করিতে হইবে।
   খ) একদিকে — কোম্পানি আর একদিকে তিনি একলা।
   গ) বরিশাল খুলনার স্টীমার লাইনে — আবির্ভাবের উপক্রম হইল।
   ঘ) তাঁহার — নামক জাহাজ হাবড়ার ব্রিজে ঠেকিয়া ডুবিয়াছে।

৪। ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর ঃ—
   ক) এই ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন না।
   খ) সেই শিক্ষা কাজে লাগানো তাঁহাদের দ্বারা ইহজীবনেও ঘটে।
   গ) তখনই তাঁহার ব্যবসায় বন্ধ হইয়া গেল না।

৫। 'জ্যোতিদাদা' সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশ
হিতৈষা যে কত প্রবল ছিল, তার প্রমাণ যে
তিনি যে, কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন
[illegible] নিবন্ধ।



প্রাচীন ভারতে রসায়ন বিজ্ঞান

প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

রসায়ন-বিজ্ঞান কি, তা হয়ত তোমরা অনেকেই জানো না। যা কিছু পদার্থ আমরা দেখতে পাই এবং ব্যবহার করি, তার উপাদান কি—সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা এবং কোন কোন উপাদানের পরস্পর সংযোগে কি উপায়ে মানুষের প্রয়োজনীয় নানা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সৃষ্টি করা যেতে পারে, তার প্রণালী উদ্ভাবন করাই রসায়ন-বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য।

আজ তোমাদের প্রাচীন ভারতে সেই রসায়ন চর্চার কয়েকটি নিদর্শনের কথা বলবো। যীশুখৃষ্ট জন্মাবার তিন শত বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দু'-হাজার দু'শো বছর আগে নাগার্জুন নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। প্রাচীন ভারতে রসায়ন-চর্চায় তিনি অশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর একাগ্র চেষ্টা ও সাধনার ফলে সেই প্রাচীনকালেও বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আবিষ্কার হয়েছিল।

মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুর শহরের কাছাকাছি একটি নিভৃত-নির্জন পাহাড়ের উপর নাগার্জুনের রসায়নাগার বা বিজ্ঞান অনুশীলন মন্দির এখনো দেখতে পাওয়া যায়।

'চরক' ও 'শুশ্রুত' নামে দু'খানি প্রসিদ্ধ প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্র আছে। ঐ দু'খানি পুস্তকে অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত-প্রণালীর

বিবরণ আছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এই দু'খানি অমূল্য গ্রন্থ খৃষ্ট-জন্মের বহুপূর্বে ভারতবর্ষে রচিত হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতের এই দু'খানি গ্রন্থে এমন সব রাসায়নিক প্রণালী ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত-বিধির বর্ণনা আছে, যা যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় সতেরো শো বছর পরে য়ুরোপে যে সব বিজ্ঞানের বই রচিত হয়েছিল কেবলমাত্র তাইতে দেখতে পাওয়া যায়। তার আগে ও দেশের কেউ এর সন্ধান জানতো না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ক্ষার প্রস্তুতের কথা বলবো।

ক্ষার সাধারণতঃ আমরা ময়লা কাপড় পরিষ্কারের জন্য ব্যবহার করি। অনেকে আজকাল সোডা দিয়েও কাপড় কাচেন। কাপড় কাচবার জন্য এবং গায়ে মাখবার জন্য আমরা যে সাবান ব্যবহার করি, তারও প্রধান উপাদান ক্ষার। সাধারণতঃ দু'রকম ক্ষার আছে। একটিকে বলে মৃদু ক্ষার, অন্যটিকে বলে তীক্ষ্ণ ক্ষার। কাপড় কাচবার জন্য যে সোডা ব্যবহার হয় সে হচ্ছে মৃদু ক্ষার। অর্থাৎ এর ক্ষার-ধর্ম বা ক্ষার-গুণ বেশী নয়; কিন্তু সাবান প্রস্তুতের জন্য যে ক্ষার ব্যবহার হয় সে হচ্ছে তীক্ষ্ণ ক্ষার অর্থাৎ তার ক্ষার-ধর্ম বা ক্ষার-গুণ খুবই প্রবল। য়ুরোপে মাত্র গত অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত রাসায়নিক গ্রন্থে সর্বপ্রথম ক্ষারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু খৃষ্ট-জন্মের বহুবৎসর পূর্বে ভারতীয় ঋষিদের রচিত গ্রন্থে এর যে সুন্দর বর্ণনা আছে, শুশ্রুতের 'ক্ষার প্রস্তুত করণ অধ্যায়' তা সপ্রমাণ করে।

আমাদের ছেলেবেলায়, প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগে, আমরা দেখেছি—গাঁয়ের গরীব লোকেরা কলার বাসনা পুড়িয়ে ছাই করত। সেই ছাইয়ের সঙ্গে তারা চুন মিশিয়ে একটি হাঁড়িতে জল দিয়ে ফুটিয়ে সেই ফুটন্ত জলে কাপড় সিদ্ধ করে ময়লা কাপড় পরিষ্কার করতো। স্থলজ উদ্ভিদ্ পোড়ালে যে মৃদু ক্ষার হয়, তাকে বলে—'পটাশ বা পটাশিয়াম কার্বনেট্'; কিন্তু সামুদ্রিক উদ্ভিদ পোড়ালে যে মৃদু ক্ষার হয়, তাকে বলে 'সোডা বা সোডিয়াম কার্বনেট্'। আবার এদের সঙ্গে চুন মিশিয়ে ফুটিয়ে নিলে যে তীক্ষ্ণ ক্ষার হয় তাকে বলে—কষ্টিক এ্যালকালি—কষ্টিক পটাশ ও কষ্টিক সোডা। শুশ্রুতের 'ক্ষার প্রস্তুত করণ অধ্যায়ে'

এই সব বিবরণ বেশ সুন্দর ভাবে বলা আছে। পটাশকে তখনকার দিনে 'যবক্ষার' বলা হতো ; কারণ যবের শীষ পুড়িয়ে ঐ ক্ষার প্রস্তুত হতো। সেকালে সোডার নাম ছিল 'সর্জিকা ক্ষার' যাকে আমরা বাংলায় 'সাজিমাটি' বলি। বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের স্থানে স্থানে জমির উপর এই সাজিমাটি সাদা চাদরের মত বা ছাতলা ধরার মত ফুটে উঠতে দেখা যায়। আজকাল বিলিতি সোডার আমদানি হওয়াতে গৃহস্থ পরিবারে এই সাজিমাটির ব্যবহার এদেশ থেকে ক্রমেই উঠে যাচ্ছে।

খনিজ ধাতুর ব্যাপারে প্রাচীন ভারতের রসায়ন বিজ্ঞান যে কতদূর উন্নতি লাভ করেছিল, তার উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায়—দিল্লীর কাছে যে পুরাতন লৌহ-স্তম্ভটি রয়েছে সেইটি দেখে। এই লৌহস্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল খৃষ্ট-পরবর্তী চতুর্থ শতকে অর্থাৎ প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। জল বাতাসের সংস্পর্শে লোহা জিনিষটায় অল্প দিনেই মরচে ধরে। কিন্তু দেড় হাজার বছর আগে তৈরী এই লোহার থামটিতে আজও পর্যন্ত বিশেষ কিছু মরচে ধরতে পারেনি ! এ অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার ! এই লৌহস্তম্ভটি প্রায় ষাট ফুট উঁচু ; অর্থাৎ প্রায় একখানি পাঁচতলা বাড়ি ছাড়িয়ে উঠেছে ! এত বড় একটি লোহার থাম বর্তমান জগতের কোনো সর্বশ্রেষ্ঠ বৃহৎ লোহার কারখানাতেও তৈয়ার করা সহজ নয়। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, প্রাচীন ভারতের ধাতুবিদেরা ধাতু নির্মাণে ও ধাতু রসায়নে বিশেষ পারদর্শী ও অভিজ্ঞ ছিলেন। সম্প্রতি য়ুরোপ ও আমেরিকার ধাতু-বৈজ্ঞানিকেরা মরিচা-বিরোধী ইস্পাত-প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করেছেন বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারত দেড়হাজার বৎসর পূর্বে এ জিনিস তৈরি করে যেতে পেরেছেন। পুরীর কাছে প্রাচীন কণারক সূর্য-মন্দিরের যে ধ্বংসাবশেষ আছে, সেখানেও এই রকম মরিচা-বিরোধী লৌহে প্রস্তুত অনেকগুলি বিশাল কড়ি পড়ে রয়েছে। লোহার তৈরী একটি বিরাট ছাতাও এই মন্দিরের কাছে পড়ে আছে, যাতে আজও পর্যন্ত মরচে ধরেনি। দেখে মনে হয় এইমাত্র কারখানা থেকে নূতন তৈরী হয়ে এসেছে। লোহার সঙ্গে অন্য কোন্ ধাতু কি পরিমাণে মেশালে লোহাতে আর মরচে ধরতে পারে না, প্রাচীন ভারতের

ধাতুবিদেরা দু'হাজার বছর আগে সেই রাসায়নিক প্রণালী আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।

প্রাচীন ভারতের এই উন্নত বিজ্ঞান সাধনা পরবর্তী যুগে ক্রমশঃ লোপ পায়। বহুকাল ভারতবাসী আর বিজ্ঞান চর্চা করেনি। সুখের বিষয় কিছুদিন থেকে ভারতবর্ষে আবার বিজ্ঞান চর্চার দিকে লোকের মন আকৃষ্ট হয়েছে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কেউ কেউ জগতের বৈজ্ঞানিক সমাজে সমাদর ও সম্মান লাভ করতে পেরেছেন, এ যে একটি মস্ত শুভ লক্ষণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। প্রাচীন ভারতের রসায়ন বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে যাহা জান নিজ ভাষায় সংক্ষেপে লিখ।

২। ক) নাগার্জুন কে ছিলেন? তাঁহার রসায়নাগার কোথায় ছিল?
   খ) শুশ্রূতের 'ক্ষার প্রস্তুত করণ অধ্যায়ে' ক্ষারের কি বিবরণ আছে?
   গ) কোন্ কোন্ বস্তু দেখিয়া প্রাচীন ভারতের মরিচা-হীন লৌহের ব্যবহারের কথা জানিতে পারি?

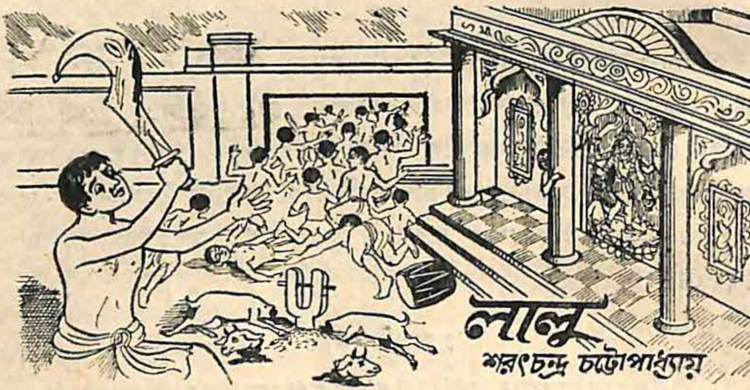
৩। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ ঃ—
   ক) তার আগে……জানতো না।
   খ) লোহা জিনিসটায়……মরচে ধরে।

৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—
   ক) তার —উদ্ভাবন করাই রসায়ন-বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য।
   খ) এই — ব্যবহার এদেশ থেকে ক্রমেই উঠে যাচ্ছে।
   গ) লোহার তৈরী একটি বিরাট — এই মন্দিরের কাছে পড়ে আছে।
   ঘ) প্রাচীন ভারতের — দু'হাজার বছর আগে সেই রাসায়নিক প্রণালী আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।

৫। ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর ঃ—
   ক) ভারতে মাত্র গত অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত রাসায়নিক গ্রন্থে সর্বপ্রথম ক্ষারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যায়।
   খ) কারণ গমের শীষ পুড়িয়ে ঐ ক্ষার প্রস্তুত হতো।
   গ) আজকাল বিলিতি সাজিমাটির আমদানি হওয়াতে গৃহস্থ পরিবারে এই সোডার ব্যবহার এদেশ থেকে ক্রমেই উঠে যাচ্ছে।

৬। যাহা জান লিখ ঃ—
   চরক ও শুশ্রূত, দিল্লীর লৌহস্তম্ভ।

[illegible] [illegible] মহাশয় প্রাচীন ভারতে [illegible]
[illegible] এই প্রবন্ধটি লিখেছেন।



পাড়ার মনোহর চাটুজ্জের বাড়ী কালীপূজো। দুপুর রাতে বলির ক্ষণ বয়ে যায়, কিন্তু কামার অনুপস্থিত। লোক ছুটলো ধরে আনতে, কিন্তু গিয়ে দেখে সে পেটের ব্যথায় অচেতন। ফিরে এসে সে সংবাদ দিতে সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসলো,—উপায়? কে একজন বললে, পাঁঠা কাটতে পারে লালু। লোক দৌড়লো তার কাছে। লালু ঘুম ভেঙে উঠে বসলো, বললে—না।

যারা ডাকতে এসেছিল তারা মাথা কুটতে লাগলো, আর দশ-পনেরো মিনিট মাত্র সময়, তারপর সব নষ্ট, সব শেষ। তখন মহাকালীর কোপে কেউ বাঁচবে না। লালুর বাবা এসে আদেশ দিলেন যেতে। বললেন, ওঁরা নিরুপায় হয়েই এসেছেন,—না গেলে অন্যায় হবে। তুমি যাও। সে আদেশ অমান্য করার সাধ্য লালুর নেই।

লালুকে দেখে চাটুজ্জে মশায়ের ভাবনা ঘুচলো। সময় নেই,—তাড়াতাড়ি পাঁঠা উৎসর্গিত হয়ে কপালে সিঁদুর, গলায় জবার মালা পরে হাড়িকাঠে পড়লো, লালুর হাতের খড়্গ নিমিষে উর্দ্ধোত্থিত হয়েই সজোরে নামলো, তারপরে বলির ছিন্নকণ্ঠ থেকে রক্তের ফোয়ারা কালোমাটি রাঙা করে দিলে। যে পাঁঠাটা অদূরে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল, আবার তার কপালে চড়লো সিঁদুর, গলায় দুললো রাঙা মালা, আবার সেই হাড়িকাঠ, সেই ভয়ঙ্কর অন্তিম আবেদন, সেই বহু কণ্ঠের

সম্মিলিত 'মা' 'মা' ধ্বনি, আবার লালুর রক্তমাখা খাঁড়া উপরে উঠে চক্ষের পলকে নীচে নেমে এলো,—পশুর দ্বিখণ্ডিত দেহটা ভূমিতলে বার কয়েক হাত-পা আছড়ে কি জানি কাকে শেষ নালিশ জানিয়ে স্থির হলো, তার কাটা গলার রক্তধারা রাঙামাটি আরও খানিকটা রাঙিয়ে দিলে।

ঢুলিরা উন্মাদের মতো ঢোল বাজাচ্ছে, উঠনে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে বহুলোকের বহুপ্রকারের কোলাহল, সুমুখের বারান্দায় কার্পেটের আসনে বসে মনোহর চাটুজ্জে মুদিত নেত্রে ইষ্ট নাম জপে রত, অকস্মাৎ লালু ভয়ঙ্কর একটা হুংকার দিয়ে উঠলো। সমস্ত শব্দ সাড়া গেল থেমে—সবাই বিস্ময়ে স্তব্ধ—এ আবার কি! লালুর অসম্ভব বিস্ফারিত চোখের তারা দু'টো যেন ঘুরছে, চেঁচিয়ে বললে, আর পাঁঠা কই?

বাড়ীর কে একজন ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে, আর ত পাঁঠা নেই। আমাদের শুধু দু'টো করেই বলি হয়।

লালু তার হাতের রক্তমাখা খাঁড়াটা মাথার উপরে বার দুই ঘুরিয়ে ভীষণ কর্কশ কণ্ঠে গর্জন করে উঠ্‌লো—নেই পাঁঠা? সে হবে না। আমার খুন চেপে গেছে—দাও পাঁঠা, নইলে আজ আমি যাকে পাবো ধরে নরবলি দেব—মা মা—জয় কালী!—বলেই একটা মস্ত লাফ দিয়ে সে হাড়িকাঠের এদিক থেকে ওদিকে গিয়ে পড়লো। তার হাতের খাঁড়া তখন বন্ বন্ করে ঘুরছে।

তখন যে কাণ্ড ঘটলো ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সবাই একসঙ্গে ছুটলো সদর দরজার দিকে, পাছে লালু ধরে ফেলে। পালাবার চেষ্টায় বিষম ঠ্যালাঠেলি হুড়োমুড়িতে সেখানে যেন দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার বেধে গেল। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। তার পরেই সমস্ত ফাঁকা।

লালু গর্জে উঠলো—মনোহর চাটুজ্জে কই? পুরুত গেল কোথায়?

পুরুত রোগা লোক, সে গণ্ডগোলের সুযোগে আগেই গিয়ে লুকিয়েছে প্রতিমার আড়ালে। গুরুদেব কুশাসনে বসে চণ্ডীপাঠ করছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে ঠাকুর-দালানের একটা মোটা থামের পিছনে গা-ঢাকা দিয়েছেন। কিন্তু,

বিপুলায়তন দেহ নিয়ে মনোহরের পক্ষে ছুটোছুটি করা কঠিন। লালু এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাতে তাঁর একটা হাত চেপে ধরলে, বললে, চলো হাড়িকাঠে গিয়ে গলা দেবে।

একে তার বজ্রমুষ্টি, তাতে ডান হাতে খাঁড়া, ভয়ে চাটুজ্জের প্রাণ উড়ে গেল, কাঁদো কাঁদো গলায় মিনতি করতে লাগলেন, লালু! বাবা! স্থির হয়ে চেয়ে দেখ—আমি পাঁঠা নই মানুষ। আমি সম্পর্কে তোমার জ্যাঠামশাই হই বাবা। তোমার বাবা আমার ছোট্ট ভাইয়ের মতো।

—সে জানিনে। আমার খুন চেপেছে—চলো তোমাকে বলি দেব। মায়ের আদেশ!

চাটুজ্জে ডুকরে কেঁদে উঠলেন—না বাবা, মায়ের আদেশ নয়, কখ্খনো নয়—মা যে জগজ্জননী।

লালু বললে—জগজ্জননী! সে জ্ঞান আছে তোমার? আর দেবে পাঁঠা বলি? ডেকে পাঠাবে আমাকে পাঁঠা কাটতে? বলো।

চাটুজ্জে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, কোন দিন নয় বাবা, আর কোন দিন নয়। মায়ের সুমুখে তিন সত্যি করছি, আজ থেকে আমার বাড়িতে বলি বন্ধ।

—ঠিক ত?

—ঠিক বাবা, ঠিক। আর কখনো না। আমার হাতটা ছেড়ে দাও বাবা, একবার পায়খানায় যাবো।

লালু হাত ছেড়ে দিয়ে বললে—আচ্ছা যাও, তোমাকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু পুরুত পালালো কোথা দিয়ে? গুরুদেব? সে কই?

এই বলে সে পুনশ্চ একটা হুংকার দিয়ে লাফ মেরে ঠাকুর দালানের দিকে অগ্রসর হতেই প্রতিমার পিছন ও থামের আড়াল হতে দুই বিভিন্ন গলার ভয়ার্ত ক্রন্দন উঠলো। সরু ও মোটায় মিলিয়ে সে শব্দ এমন অদ্ভুত ও হাস্যকর যে, লালু নিজেকে আর সামলাতে পারলে না। হাঃ হাঃ হাঃ—করে হেসে উঠে সে খাঁড়াটা ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে বাড়ি ছেড়ে পালালো।

তখন কারো বুঝতে আর বাকি রইল না লালু শয়তানি করে এতক্ষণ সবাইকে ভয় দেখাচ্ছিল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে যে যেখানে পালিয়েছিল ফিরে এসে জুটলো। ঠাকুরের পূজো তখনো বাকি, তাতে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটেছে, এবং মহা হৈচৈ কলরবের মধ্যে চাটুজ্জেমশাই সকলের সম্মুখে বারবার প্রতিজ্ঞা করতে লাগলেন—ঐ বজ্জাত ছোঁড়াটাকে যদি না কাল সকালেই ওর বাপকে দিয়ে পঞ্চাশ ঘা জুতো খাওয়াই ত আমার নামই মনোহর চাটুজ্জে নয়।

কিন্তু জুতো তাকে খেতে হয়নি। ভোরে উঠেই সে যে কোথায় পালালো, সাত আট দিন কেউ তার খোঁজ পেলে না। দিন সাতেক পরে একদিন অন্ধকারে লুকিয়ে মনোহর চাটুজ্জের বাড়িতে ঢুকে তাঁর ক্ষমা এবং পায়ের ধূলো নিয়ে সে-যাত্রা লালু বাপের ক্রোধ থেকে নিস্তার পেলে। কিন্তু সে যাই হোক্, দেবতার সামনে সত্য করেছিলেন বলে চাটুজ্জে-বাড়ির কালীপূজোয় তখন থেকে পাঁঠা বলি উঠে গেল।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। লালুর গল্পটি নিজের ভাষায় লিখ।

২। ক) 'যারা ডাকতে এসেছিলো তারা মাথা কুটতে লাগলো'—কারা মাথা কুটিতে লাগিল? কাহার কাছে? কেন?

খ) 'আর ত পাঁঠা নেই'—কাহাকে একথা বলা হইয়াছে? কেনই বা বলা হইয়াছে?

গ) 'কিন্তু জুতো তাকে খেতে হয়নি'—কাহাকে জুতা খাইতে হয় নাই? কেন জুতা খাইতে হয় নাই?

৩। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :—

ক) কি জানি কাকে……স্থির হলো।

খ) না বাবা, মায়ের……মা যে জগজ্জননী।

৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

ক) ঢুলিরা — মতো ঢোল বাজাচ্ছে।

খ) মনোহর চাটুজ্জে কই? — গেল কোথায়?

গ) আমার নামই — — নয়।

৫। ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর :—

ক) আমাদের শুধু তিনটে করেই বলি হয়।

খ) পুরুত মোটা লোক,

গ) আমার হাতটা ছেড়ে দাও বাবা, একবার বাথরুমে যাব।



সামনের দিকে চাইতেই এক গম্ভীর দৃশ্য শঙ্করের চোখে পড়ল। কুয়াশা কখন কেটে গেছে, তার সামনে বিশাল রিখটারসভেল্ড পর্বতের প্রধান থাক্ ধাপে-ধাপে উঠে মনে হয় যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেচে। পাহাড়ের কটিদেশ নিবিড় বিদ্যুৎগর্ভ মেঘপুঞ্জে আবৃত, কিন্তু উচ্চতম শিখররাজি অস্তমান সূর্যের রঙিন আলোয় দেবলোকের কনকদেউলের মতো বহুদূর নীল শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।

পরদিন খুব সকাল থেকে পর্বতারোহণ শুরু হল। শঙ্করের ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে ছটা। সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতে শঙ্কর আর চলতে পারে না। যে জায়গাটা দিয়ে তারা উঠচে—সেখানে পর্বতের খাড়াই চার মাইলের মধ্যে উঠেচে ছ হাজার ফুট, সুতরাং পথটা ঢালু হলেও কি ভীষণ দুরারোহ তা সহজেই বোঝা যাবে।

বড় চমৎকার বন, যেন পরীর রাজ্য! মাঝে মাঝে ছোটো-খাটো ঝরনা বনের মধ্যে দিয়ে খুব উপর থেকে নিচে নেমে যাচ্ছে। গাছের ডালে-ডালে নানা রঙের টিয়াপাখি চোখ ঝলসে দিয়ে উড়ে বেড়াচ্চে। বড়-বড় ঘাসের মাথায় শাদা-শাদা ফুল, অর্কিডের ফুল ঝুলচে গাছের ডালের গায়ে, গুঁড়ির গায়ে।

হঠাৎ শঙ্করের চোখ পড়ল, গাছের ডালে মাঝে মাঝে লম্বা দাড়ি গোঁফওয়ালা বালখিল্য মুনিদের মতো ও কারা বসে রয়েচে! তারা সবাই চুপচাপ বসে, মুনিজনোচিত গাম্ভীর্যে ভরা। ব্যাপার কী?

আলভারেজ বললে—ও কলোবাস জাতীয় স্ত্রী বাঁদর। পুরুষ জাতীয় কলোবাস বাঁদরের দাড়ি-গোঁফ নেই, স্ত্রী জাতীয় কলোবাস বাঁদরের হাতখানেক লম্বা দাড়ি-গোঁফ গজায় এবং তারা বড় গম্ভীর।

মাইলের পর মাইল বুনো বাঁশের জঙ্গল, তার তলায় বুনো আদা। ওদের পথের একশো হাতের মধ্যে বাঁ দিকের বাঁশ বনের তলা দিয়ে একটা প্রকাণ্ড হস্তীযূথ কচি বাঁশের কোঁড় মড়মড় করে ভাঙতে ভাঙতে চলে গেল।

পাঁচহাজার ফুট উপরে কত কি বুনো ফুলের মেলা—টকটকে লাল ইরিথ্রিনা প্রকাণ্ড গাছে ফুটেচে। পুষ্পিত ইপোমিয়া লতার ফুল দেখতে ঠিক বাঙলাদেশের বনকলমি ফুলের মতো, কিন্তু রঙটা অত গাঢ় বেগুনী নয়। শাদা ভেরোনিকা বন সুগন্ধে বাতাসকে ভারাক্রান্ত করেচে। বর্ন্য কফির ফুল, রঙিন বেগোনিয়া। মেঘের রাজ্যে ফুলের বন, মাঝে মাঝে শাদা বেলুনের মত মেঘপুঞ্জ গাছপালার মগডালে এসে আটকাচ্চে—কখনো বা আরও নেমে এসে ভেরোনিকার বন ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্চে।

সাড়ে সাত হাজার ফুটের উপর থেকে বনের প্রকৃতি একেবারে বদলে গেল। এখানে বনানীর মূর্তি বড় অদ্ভুত, প্রত্যেক গাছের গুঁড়ি ও শাখাপ্রশাখা পুরু শেওলায় আবৃত, প্রত্যেক ডাল থেকে শেওলা ঝুলচে—সে শেওলা কোথাও কোথাও এত লম্বা যে, গাছ থেকে ঝুলে প্রায় মাটিতে এসে ঠেকবার মতো হয়েচে —বাতাসে সেগুলো আবার দোল খাচ্চে, তার উপর কোথাও সূর্যের আলো নেই, সব সময়ই যেন গোধূলি। আর সবটা ঘিরে বিরাজ করচে এক অপার্থিব ধরনের নিস্তব্ধতা—বাতাস বইচে তারও শব্দ নেই, পাখির কূজন নেই সে বনে—মানুষের গলার সুর নেই, কোনো জানোয়ারের ডাক নেই। যেন কোন অন্ধকার নরকে দীর্ঘশ্মশ্রু প্রেতের দলের মধ্যে এসে পড়েচে ওরা।

সেদিন অপরাহ্নে তাঁবুর বাইরে বসে এক পাত্র কফি খেতে খেতে শঙ্করের মনে হল, এ যেন সৃষ্টির আদিম যুগের অরণ্যানী, পৃথিবীর উদ্ভিদ জগৎ যখন কোনো একটা সুনির্দিষ্ট রূপ ও আকৃতি গ্রহণ করে নি। যে যুগে পৃথিবীর বুকে বিরাটকায় সরীসৃপের দল জগৎজোড়া বন-জঙ্গলের নিবিড়

অন্ধকারে ঘুরে বেড়াত—সৃষ্টির সেই অতীত প্রভাতে সে যেন কোন যাদু-মন্ত্রের বলে ফিরে গিয়েচে।

পরদিন খুব মেঘ করে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। পর্বতের ঢাল বেয়ে যেন হাজার ঝরনার ধারায় বৃষ্টির জল গড়িয়ে নিচে নামচে। শঙ্করের কেমন একটা অবসাদ এসেচে দেহে ও মনে—সন্ধ্যার দিকে যখন সমগ্র পর্বত ও অরণ্য মেঘের অন্ধকারে ও সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকার হয়ে ভীমদর্শন ও গম্ভীর হয়ে উঠল, তখন ওর মনে হল—এই অজানা দেশে অজানা পর্বতের মাথায় ভয়ানক হিংস্রজন্তুসঙ্কুল বনের মধ্যে দিয়ে, বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যায়, কোন অনির্দেশ্য হীরকখনি বা তার চেয়েও অজানা মৃত্যুর অভিমুখে চলেছে সে কোথায়? কেন সে এখানে এল? হীরের খনিতে তার দরকার নেই। বাঙলাদেশের খড়ে ছাওয়া ঘর, ছায়াভরা শান্ত গ্রাম্যপথ, ক্ষুদ্র নদী, পরিচিত পাখিদের কাকলি—সে সব যেন কতদূরের কোন অবাস্তব স্বপ্ন-রাজ্যের জিনিস, আফ্রিকার কোনো হীরকখনি সে সবের চেয়ে মূল্যবান নয়।

কিন্তু তার এ ভাব কেটে গেল অনেক রাত্রে, যখন নির্মেঘ আকাশে চাঁদ উঠল। সে অপার্থিব জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির বর্ণনা নেই। শঙ্কর আর পৃথিবীতে নেই, বাঙলা বলে কোনো দেশ নেই, সব স্বপ্ন হয়ে গিয়েচে। সে আর কোথাও ফিরতে চায় না। হীরে চায় না, অর্থ চায় না—পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বহু উর্ধ্বের এক কৌমুদী-শুভ্র দেবলোকের এখন সে অধিবাসী। তার চার ধারে প্রকৃতির যে সৌন্দর্য, কোনো মানুষের চোখ এর আগে তা দেখেনি। সে গহন নিস্তব্ধতা, এর আগে কোনো মানুষ অনুভব করেনি। জনমানবহীন বিশাল রিখটারসভেল্ড পর্বত ও অরণ্য এই গভীর নিশীথে মেঘলোকে আসন পেতে আপনাতে আপনি আত্মস্থ, ধ্যানস্তিমিত—পৃথিবীর মানুষের সেখানে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য ক্বচিৎ ঘটে।

রাত ভোর হবার সঙ্গে-সঙ্গে এল মুষলধারে বৃষ্টি, সঙ্গে-সঙ্গে যেমনি বিদ্যুৎ, তেমনি মেঘগর্জন। সে বৃষ্টি চলল সমানে সারাদিন, তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। শঙ্করের মনে হল, পৃথিবীতে আজ প্রলয়ের বর্ষণ শুরু হয়েছে, প্রলয়ের দেবতা সৃষ্টি ভাসিয়ে দেবার সূচনা করেচেন বুঝি।

বৃষ্টি থামল যখন, তখন বিকেল পাঁচটা।

সে রাত্রে বর্ষাস্নাত বনভূমির মধ্য দিয়ে মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার আলোয় অবিশ্রান্ত হাঁটবার পরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওরা এসে স্যাডলে (সমতল খাঁজে) উঠল। স্যাডলটার বিস্তৃতি তিন মাইলের কম নয়, কখনো বা দুশো ফুট খাড়া উঠেচে, কখনো বা চার পাঁচশো ফুট নেমে গিয়েচে এক মাইলের মধ্যে, সুতরাং বেশ দুরারোহ—যতটুকু সমতল, ততটুকু শুধুই বড় বড় বনস্পতির জঙ্গল, ইরিথ্রিনা, পেনসিয়ানা, রিঠাগাছ, বাঁশ, বা বন্য আদা। বিচিত্র বর্ণের অর্কিডের ফুল ডালে-ডালে। বেবুন ও কলোবাস বাঁদর সর্বত্র।

আরও দুদিন ধরে ক্রমাগত নামতে-নামতে রিখটারসভেল্ড পর্বতের আসল রেঞ্জের ওপারের উপত্যকায় গিয়ে ওরা পদার্পণ করল।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। রিখটারসভেল্ডের ওপারের উপত্যকায় পৌঁছিবার পথে প্রাকৃতিক দৃশ্যের যে বর্ণনা লেখক দিয়াছেন, নিজ ভাষায় তাহার বর্ণনা দাও ;

২। ক) 'সামনের দিকে চাইতেই এক গম্ভীর দৃশ্য শঙ্করের চোখে পড়ল'—দৃশ্যটির বর্ণনা দাও।

খ) পাঁচ হাজার ফুট উপরে শঙ্কর কি দৃশ্য দেখিয়াছিল ?

গ) 'সব স্বপ্ন হয়ে গিয়েচে'—কাহার সব স্বপ্ন হইয়া গিয়াছিল ? তখন তাহার কি মনে হইতেছিল ?

৩। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :—

ক) বড় চমৎকার বন, যেন পরীর রাজ্য !

খ) সৃষ্টির সেই অতীত প্রভাতে……বলে ফিরে গিয়েচে।

গ) পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বহু……এখন সে অধিবাসী।

৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

ক) ও — জাতীয় স্ত্রী বাঁদর।

খ) যেন কোন অন্ধকার নরকে — প্রেতের দলের মধ্যে এসে পড়েচে ওরা।

গ) সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওরা এসে —উঠল।

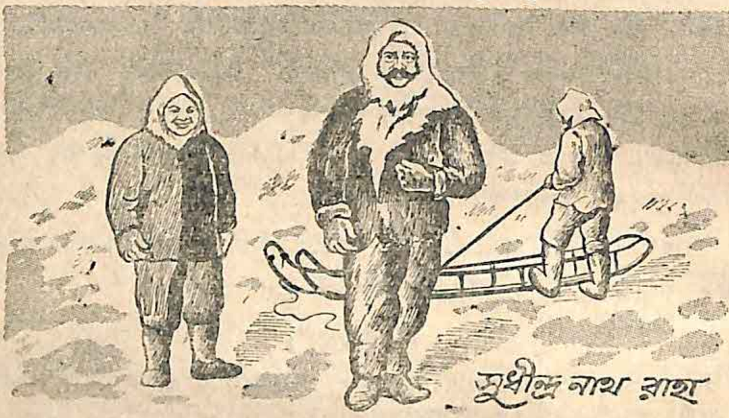
৫। ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর :—

ক) পুরুষ-জাতীয় কলোবাস বাঁদরের দাড়ি-গোঁফ আছে।

গ) সাড়ে তিন হাজার ফুটের উপর থেকে বনের প্রকৃতি একেবারে বদলে গেল।

গ) বৃষ্টি থামল যখন, তখন সকাল পাঁচটা।

উত্তর মেরু পথে পিয়ারী



"চালাও জাহাজ—" আদেশ দিলেন কমাণ্ডার পিয়ারী।

ইঞ্জিনিয়ার প্রেষ্টন একবার মুখ তুলে চাইল কমাণ্ডারের দিকে। এক পলকের জন্যই চোখাচোখি কমাণ্ডারে আর ইঞ্জিনিয়ারে। ইঞ্জিনিয়ারের অনুচ্চারিত বক্তব্য বুঝলেন কমাণ্ডার। সে বক্তব্য এই যে ঠাণ্ডা মেজাজে এতগুলি লোককে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছেন পিয়ারী, নিজেরও সেই সঙ্গে।

এই জ্যাকসন সাগর, প্রায় দুইশো মাইল এর বিস্তার। এর শুরুতেই দেখা মিলেছে জমাট বরফের। পুরু আস্তরণ, জলের উপরে তিন ফুট বরফ, নীচে নর দশ ফুট। অবশ্য অবিচ্ছিন্ন নয় এই সাদা ঢাকনাটা, মাঝে মাঝে চিড় আছে এখানে সেখানে, কষ্টে স্থষ্টে এঁকে বেঁকে জাহাজ চালানো যেতেও পারে সেই সব সর্পিল খাল ধরে ধরে।

কিন্তু এ ত গেল এখনকার কথা। পরে কী হবে? পরে? মেরুর দিকে যত এগুনো যাবে, বরফ ত তত বেশী বেশী পড়বে সম্মুখে! হয়ত ভাসমান বরফ-ক্ষেত্রটার উচ্চতা তখন তিন ফুটের জায়গায় ত্রিশ ফুট দেখা যাবে। হয়ত

এখনকার মত তখন আর চিড় দেখতে পাওয়া যাবে না সেই বরফের রাজ্যে—হয়ত—

কিন্তু আদেশ আদেশই। তর্কের কথা মনে ঠাঁই দেয় না কোন কর্মচারী। মৃত্যু নিশ্চিত জানলেও তার মুখে এগিয়ে যায় দৃঢ় চরণে। বুকের ভিতরটা কেঁপে কেঁপে উঠলেও যেতেই হয় তাকে।

জাহাজ চলল, প্রথমে "ফর্মিডেবল", পিছনে "সী-হক"।

খাল বেয়ে বেয়ে, এঁকে বেঁকে। সব জায়গায় জাহাজ চলবার মত চওড়া নয় সে খাল।

করাতের সাহায্যে বরফ কেটে কেটে পথ চওড়া করে নিচ্ছে ফর্মিডেবল। এ করাত জাহাজের গায়েই সংলগ্ন, হাত দিয়ে একে চালাতে হয় না।

কষ্টে সৃষ্টে হলেও গোটা দশেক সামুদ্রিক মাইল এইভাবে এগিয়ে গেল জাহাজ দুটো। তারপর দেখা গেল বরফ আস্তরণ ক্রমেই উঁচু থেকে আরও উঁচু হচ্ছে।

যে-খাল বেয়ে আসছিল জাহাজ, ক্রমেই তা চেপে যাচ্ছে দুই দিকে। জাহাজ আর এগুতে পারে না এক ইঞ্চিও। বরফ-কাটা করাত অকেজো হয়ে গিয়েছে, বরফ এখানে এত বেশী পুরু, করাতে তা কাটে না।

ইঞ্জিনিয়ার প্রেষ্টন রিপোর্ট দিতে এল।

কিন্তু রিপোর্ট বাহুল্যমাত্র। অবস্থা কি পিয়ারী টের পান নি? পেয়েছেন।

উপায়? জাহাজ ফেরানো? সে রকম ইচ্ছা ত পিয়ারীর নেই-ই, থাকলেও সে ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করার উপায় নেই কিছু। ঐ সরু নালার ভিতর জাহাজ ঘোরানো যাবে কেমন করে? তা ছাড়াও, আর একটা সম্ভাবনার কথাও ভেবে দেখা দরকার। পিছনের রাস্তা হয়ত এখন আর খোলাও নেই। যেটুকু জল ছিল অনাবৃত, তা হয়ত এতক্ষণ ভেসে আসা বরফের চাঙড়ে বিলকুল বুজে গিয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ার এসে স্যালিউট দিতেই পিয়ারী বললেন—"থামিয়ে দাও জাহাজ। ঐ বরফের মাঠে তাম্বু ফেলব।"

তাম্বু পড়ল বরফের উপর। অনেকগুলো তাম্বু। কাপ্তেন যুগলের জন্য

আলাদা দুটো, অধস্তন কর্মচারী লেফটেনাণ্ট মেট সারেংদের জন্য গোটা ছয়, সাধারণ নাবিকদের জন্য গোটা কুড়ি—

জাহাজে কেউ থাকবে না। কারণ পিয়ারীর আশঙ্কা—জাহাজ না টিকতে পারে বেশী দিন। বরফের চাপে—

আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তা প্রমাণ হয়ে গেল পরের রাত্রিতেই। ঝড় উঠল একটা যেমন-তেমন ঝড় নয়, মেরুমণ্ডলের তুষারঝঞ্ঝা। বরফকুচি উড়তে লাগল হাওয়ায়, যে-হাওয়ার বেগ তখন ঘণ্টায় একশো মাইল। তাম্বুর ভিতর বসে বিনিদ্ররজনী যাপন করছে দুশোটা মানুষ, কমাণ্ডার থেকে কুলী পর্যন্ত সবাই।

গভীর রাত্রে গোটাকতক শব্দ হল—বজ্রনাদের মত। থরথর করে কাঁপতে লাগল গোটা তুষারক্ষেত্রটা। নাবিকেরা যীশুর নাম করে চিৎকার করতে লাগল। তারা ভাবছে—ক্ষেত্রটাই দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে জলের তলায় বিলীন হয়ে যায় বুঝি।

পিয়ারী সেই ঝড়ের মধ্যেই ছুটে বেরুলেন টর্চ নিয়ে। সী-হকের কাপ্তেন হাচিনসনও এলেন সঙ্গে। যা তাঁরা ভয় করেছিলেন, ঠিক তাই ই ঘটেছে। দুই ধার থেকে বরফস্তূপ এসে চেপে ধরেছে জাহাজ দুটোকে। সেই বজ্রপেষণে আগাগোড়া কেটে গিয়েছে দুটো জাহাজই, আর জলের ভিতর থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠে পড়েছে বরফক্ষেত্রের উপরে।

জিনিসপত্র? বেশির ভাগ জিনিস আগেই নামিয়ে আনা হয়েছিল। যা-কিছু পড়েছিল, তাও হয়ত নষ্ট হবে না, যদি না ঝড়ের তাণ্ডবে দুই-আধখানায় বিভক্ত জাহাজ একেবারে এলিয়ে আলাদা হয়ে পড়ে।

সী-হক তাই পড়ল, কম্বিডেবল পড়ল না। পিয়ারী বললেন—"ক্ষতি কী! জ্বালানির জন্য জাহাজ হয়ত ভাঙতেই হত আমাদের—"

জ্বালানির জন্য! অর্থাৎ পিয়ারী অনেক পরের কথা এখন থেকেই চিন্তা করে রেখেছেন। দুই তিন মাসের মত জ্বালানি মজুদই ত রয়েছে—কয়লা পেট্রল ইত্যাদি। জ্বালানির জন্য জাহাজ ভাঙার দরকার হবে, যদি তিন মাসের ভিতরও এই মেরুরাজ্য ছেড়ে দক্ষিণমুখী পাড়ি না জমানো যায়।

তিন মাস পরে শীত পড়বে প্রচণ্ড। মেরুর শীত। চব্বিশঘণ্টা আগুন জ্বালিয়ে রাখতে না পারলে মানুষগুলো তখন জমে বরফ হয়ে যাবে সবাই।

শীত! মেরুমণ্ডলের শীত ঋতু। একটানা ছয়মাস চলবে তখন সূর্যহীন কালরাত্রি। মাঝে মাঝে মেরুজ্যোতির উদয় যদি হয়, সমগ্র বহিঃ প্রকৃতি সমুদ্র গগন দূর পর্বতের মুখে তা মাখিয়ে দেবে এক মায়াময় মোহময় আবেদন, যার দিকে তাকিয়ে থাকলে অতি বাস্তববাদী মনও ধীরে ধীরে কোমল, উদাস, ভারাতুর হয়ে আসে।

সেই শীত এখানে যাপন করবার কথা চিন্তা করছেন পিয়ারী। তা নইলে জাহাজ ভেঙে জ্বালানী কাঠের সংস্থান করার কথা ওঠে কেন?

বিষয়টা নিয়ে নাবিকমহলে ফুসফুস গুজগুজ শুরু হল।

আন্দাজ করলেন পিয়ারী, সন্দেহটা আপনা থেকেই জেগেছে নাবিকদের মনে। এ পরিবেশে না জাগাই আশ্চর্য হত। সবাই জানে যে পিয়ারী এবার শেষ পর্যন্ত দেখবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়েই অভিযানে বেরিয়েছেন। একটা গ্রীষ্মে মেরু পর্যন্ত পৌঁছোনো যে কোন কাপ্তেনের পক্ষেই দুরূহ, তাও জানে সবাই। সুতরাং দুইয়ে দুইয়ে যোগ করে নাবিকেরা চারই ঠিক করল। অনুমান করে নিল কমাণ্ডারের চিন্তাধারা কোন্ পথে বইছে।

অনুমান থেকে জল্পনা, জল্পনা থেকে অসন্তোষ—ধিকি ধিকি জ্বলতে শুরু হল একটা চাপা আগুন।

বহুলোক যেখানে, একত্র হয়, বিভিন্ন স্থান থেকে এসে, সেখানে সবাই শৃঙ্খলাপরায়ণ হবে, এটা আশা করা যায় না। জাহাজের উপরে জীবনযাত্রা একরকম, উন্মুক্ত তুষারক্ষেত্রে তাম্বুর তলায় তা অন্যরকম। কাজ কম, ফুরসত বেশী, কে না জানে যে অলস মস্তিষ্কই শয়তানের কারখানা?

কাজ কম, অর্থাৎ বেশির ভাগ লোকেরই কম। যে কয়েকজন ছুতোর কামার আছে দলে, তারা উদয়াস্ত খাটছে। স্লেজ গড়ছে তারা। দুখানা চ্যাপ্টা কাঠ সমান্তরাল ভাবে বরফের উপর পেতে তার উপরে গড়া হয় একখানা শক্ত মাচা।

কাঠ হুটোর আগায় থাকে জোয়ালের মত একটা জিনিস। সেই জোয়ালে জুড়ে দেওয়া হয় কুকুর বা হরিণ।

পিয়ারীও নিশ্চিন্ত নেই, বরফের রাজ্যে চারিদিকে চর পাঠাচ্ছেন দলে দলে। এস্কিমো দেখলে তাদের যেমন করে হোক শিবিরে নিয়ে আসতে হবে। তৃতীয় দিনে নাবিকেরা সত্যিই হাজির করল একজন এস্কিমোকে। নাম ওর নাকাহুকা, সাদাসিধে হাসিখুশী মানুষ। একটা বলগা হরিণের পিছনে তাড়া করে করে ঝোঁকের মাথায় এসে পড়েছে এদিকে, তা নইলে এই অঞ্চল ওদের আনাগোনার গণ্ডীর বাইরে।

নাবিকদের মধ্যে পীটার সল এস্কিমো ভাষা জানে একটু আধটু। নাকাহুকার সঙ্গে কথা কয়ে সে পিয়ারীকে জানাল, স্লেজ টানবার জন্য কুকুর ও যোগাড় করে দিতে পারে, আছে ঢের ঢের কুকুর ওদের গাঁয়ে। কিন্তু গাঁ (উত্তর পানে) একবেলার পথ। কুকুরগুলোকে উলটো দিকে টেনে আনার চেয়ে এটুকু রাস্তা মানুষেই যদি খালি স্লেজ টেনে নিয়ে যায় ত ভাল হয় না কি?

প্রস্তাবটা খারাপ মনে হল না পিয়ারীর। তিনি নাবিকদের সেইরকমই আদেশ দিতে যাচ্ছিলেন বুঝি, পীটার সল স্যালিউট দিল হঠাৎ। সে বলতে চায় কিছু। পীটার সলের যা বলবার ছিল, তা সে বলল গোপনে।

প্রত্যেকটা নাবিকের মনে বারুদ যেন গাদা হয়ে আছে, এ রকম একটা আদেশ এই মুহূর্তে যদি দেওয়া হয়, তবে একটা বিদ্রোহই ঘটে যেতে পারে। তবে বিশ্বস্ত জনা পঞ্চাশ লোক যে কোন হুকুম পালন করতে রাজী হবে মনে হয়।

নাম জেনে নিয়ে বেছে বেছে তাদের আদেশই দিলেন পিয়ারী। চার-খানা স্লেজ খালিই চলল সাথে সাথে।

বাদবাকী লোক বরফক্ষেত্রের শিবিরে রয়ে গেল হাচিনসনের তত্ত্বাবধানে।

এস্কিমো পল্লীতে গিয়ে চল্লিশটা সবল শিক্ষিত কুকুর যোগাড় করা হল। নাকাহুকা সঙ্গে চলল লাফাতে লাফাতে। সাহেবদের সঙ্গে করে আনার দরুন রাতারাতি সে একটা কেউকেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্রামে। সাহেব আসা ত সোজা

ব্যাপার নয়! ওর অর্থ ই হল গাদাগাদা উপহার—ছুরি, কাঁচি, সূচ, সুতো, কফি, রঙিন রুমাল—আরও কত কী দেবদুর্লভ পদার্থ! পল্লীর ইগলুতে ইগলুতে সেদিন গালভরা হাসি।

সমতল বরফক্ষেত্রের উপর দিয়ে স্লেজ ছোটে মসৃণভাবে, উঁচুনীচু পাহাড়ের গা বেয়ে চলে ঠোক্কর খেতে খেতে। মাঝে মাঝে চওড়া চিড় বরফের আস্তরণে। তক্তা আনা হয়েছিল সঙ্গে, তাই দিয়ে দুই মিনিটে পুল তৈরী হয়ে যায়, মাল সমেত স্লেজ ছুটে বেরিয়ে যায় তার উপর দিয়ে। মানুষগুলি প্রায়ই হেঁটে চলে, ক্বচিৎ কেউ অতিমাত্র অসুস্থ বা শ্রান্ত মনে করলে, তবেই স্লেজে উঠে বসবার হীনতা স্বীকার করতে সে বাধ্য হয়।

রাত্রে তাম্বু পড়ে এমন জায়গায়, যেখানে আকস্মিক তুষার ঝঞ্ঝার আক্রমণ ঘটলেও মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার ভয় নেই। স্থান বাছাই করেন পিয়ারী নিজেই, প্রায়ই কোন পাহাড়ের আড়ালে।

অবশেষে সেই একদিন। জ্যাকসন সাগর থেকে যাত্রা শুরুর প্রায় দুইমাস পরে। পাহাড় থেকে নেমে সমুদ্রের তীরে দাঁড়ালেন পিয়ারী। সমুদ্র বটে, কিন্তু যে তুষার-আস্তরণের নীচে চাপা পড়ে আছে সে-সমুদ্র, তা যে কত শো ফুট গভীর, তা হিসাব করার উপায় নেই। এ তুষার চিরতুষার, চরম শীতের দিনেও যেমন, তথাকথিত গরমের দিনেও তেমনি। কোনদিন এর এক কণা তুষার গলে না কোন উত্তাপে।

এই সমুদ্রই মেরু সমুদ্র।

যন্ত্রপাতি বার করে হিসাব করতে বসলেন পিয়ারী। সন্তর্পণে এগিয়ে গেলেন কয়েক মাইল। তারপর আবার সযত্নে সাবধানে অনেকক্ষণ ধরে হিসাব মিলিয়ে একটা ছোট্ট তুষার ঢিবির উপরে প্রোথিত করলেন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা—"এইখানে! এইখানেই পৃথিবীর উত্তরতম বিন্দু! এই হল সুমেরু!"

পূরো একটা দিন সেইখানে চলল আনন্দোৎসব। তারপর তুষারপ্রোথিত জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করে পিয়ারী ফিরলেন জ্যাকসন সাগরের শিবির পানে।

শীত এসে পড়েছে। যে দেড়শোর মত নাবিক সেখানে বসেছিল হাচিনসনের তত্ত্বাবধানে, তারা আছে ত এখনো? না, পিয়ারীর আশা ছেড়ে দিয়ে ঘরের পথে পা বাড়িয়েছে?

অনুশীলনী

১। 'এইখানেই পৃথিবীর উত্তরতম বিন্দু! এই হল সুমেরু"—সুমেরু অভিযান ও আবিষ্কারের কাহিনীটি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ কর।

২। ক) 'চালাও জাহাজ' এবং 'থামিয়ে দাও জাহাজ'—একই কমাণ্ডার কোন কোন্ পরিস্থিতিতে এইরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন?

খ) 'এক পলকের জন্তই চোখোচোখি হল কমাণ্ডারে আর ইঞ্জিনিয়ারে'—এই চোখো-চোখি হইবার কি কারণ? ইঞ্জিনিয়ার কি বলিতে চাহিয়াছিলেন?

গ) 'আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তা প্রমাণ হয়ে গেল পরের রাত্রিতেই'—কোন্ আশঙ্কা? কি ভাবে প্রমাণিত হইল?

ঘ) 'ফুসফুস গুজগুজ শুরু হলো'—কি বিষয় লইয়া ও কাহাদের মধ্যে ফুসফুস গুজগুজ শুরু হইয়াছিল? সেই কথা তাহারা কিভাবে জানিতে পারিয়াছিল?

৩। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ:—

ক) অতি বাস্তববাদী……ভারাতুর হয়ে আসে।

খ) ধিকি ধিকি……চাপা আগুন।

গ) পল্লীর ইগলুতে……গালভরা হাসি।

৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:—

ক) জাহাজ চলল, প্রথমে 'ফর্মিডেবল', পিছনে —।

খ) কোনদিন এর এক কণা তুষার গলে না কোন —।

৫। ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর:—

ক) ইঞ্জিনিয়ার প্রেষ্টন রিপোর্ট দিতে এল না।

খ) প্রস্তাবটা খারাপ মনে হল পিয়ারীর।

৬। টীকা লিখ:—স্লেজ, মেরুজ্যোতি, এস্কিমো, ইগলু।

মেরুদেশে প্রথম [illegible] সাল আবিষ্কারে [illegible] কাহিনী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।



এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

১৭৫৭, ২৩শে জুন, বৃহস্পতিবার, সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে, সেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা পলাশীর প্রান্তর থেকে পলায়ন করেন।

সেদিন থেকে, ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত একশো নব্বুই বছর ধরে ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতার আন্দোলন করে এসেছে, তা এক বিচিত্র অধ্যায়। জগতের রাজনীতির ইতিহাসে সে-আন্দোলনের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আমরা ইংরেজের অধীন হই। ঠিক তার একশো বছর যখন পূর্ণ হয়ে আসছিল, সেই সময় একজন চরম দুঃসাহসিক ভারতীয় একজন মারাঠী, নাম নানাসাহেব এবং তাঁর সব চেয়ে বড় বন্ধু একজন মুসলমান ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের সমস্ত পরিকল্পনা গড়ে তোলেন। সেই বিস্মৃত-স্মৃতি মুসলমানের নাম হলো, আজিমুল্লাহ্ খাঁ।

পেশওয়ার বংশধর রাজ্যচ্যুত নানাসাহেব বিঠুরে ইংরেজদের দেওয়া পেনসনে জীবন নির্বাহ করতে বাধ্য হন। যদিও অলস ধনীর মত কিন্তু তাঁর অন্তরে পরাধীনতার জ্বালা আগুনের মতন জ্বলতেই থাকে। নানাসাহেবের সঙ্গে আজিমুল্লাহ্ খাঁর আলাপ হয়। অপূর্ব চরিত্র ছিল আজিমুল্লাহ্ খাঁর। অতি দারিদ্র অবস্থা থেকে তিনি নিজের চেষ্টায় জীবনে বিস্ময়কর কৃতিত্ব অর্জন করেন।

বাল্যকালে দারিদ্র্যের দরুন ইংরেজ রাজপুরুষদের বাড়িতে খানসামার কাজ করতে করতে তিনি ইংরেজী শেখেন। তাঁরও মনে জেগে উঠলো স্বাধীনতার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা। তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে নানাসাহেব তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন এবং সেই বন্ধুত্ব এত প্রগাঢ় হয়ে উঠলো যে দুজনে একসঙ্গে মিলে ভারত-উদ্ধারের পরিকল্পনা করতে লাগলেন। দুজনেই ঠিক করলেন, সামনে ১৮৫৭ সালে, পলাশীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁরা ভারতব্যাপী এক বিরাট বিপ্লব গড়ে তুলবেন।

এই উদ্দেশ্যে নানাসাহেব গোপনে আজিমুল্লাহ্-কে য়ুরোপে পাঠিয়েছিলেন সেখানকার রাজনীতি ও রণনীতি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা করে আসতে। য়ুরোপ থেকে ফিরে এসে, নানাসাহেব আর তিনি দুজনে মিলে, এক বিরাট পরিকল্পনা গড়ে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের আয়োজন শেষ করলেন। ঠিক হল, পলাশীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৮৫৭ সালে একটা দিন নির্দিষ্ট হবে, সেই দিন সারা ভারতবর্ষে প্রত্যেক বিপ্লবী দল একসঙ্গে প্রকাশ্যে বিপ্লব ঘোষণা করে উঠবে।

বারাকপুরে দেশী সিপাইদের ছাউনিতে মঙ্গল পাণ্ডে বলে গোপন বিপ্লবী দলের একজন সৈনিক নির্দিষ্ট দিনের আগে একদিন ইংরেজ সামরিক অফিসারের আদেশ অমান্য করে বসলেন। ইংরেজ অফিসার তাঁকে শাস্তি দিতে এলে, মঙ্গল পাণ্ডে সেইখানেই মুক্ত কৃপাণ দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেল্লেন এবং উত্তেজনার বশে, চিৎকার করে বিপ্লবী দলের অন্য সব সেপাইদের প্রকাশ্যে ডাক দিয়ে উঠলেন, মারো ফিরিঙ্গী।

বারাকপুরের ইংরেজ সামরিক অফিসাররা তৎক্ষণাৎ সজাগ হয়ে উঠে সেই বিপ্লব দমন করলো এবং সেই ঘটনা থেকে তারা গোপন ষড়যন্ত্রের কথা জেনে গেলো। বারাকপুর ছাউনীর সিপাহীদের বিপ্লবের সংবাদ অন্য জায়গার সিপাহীদের কাছে গিয়ে পৌছতে, তারাও বিপ্লব ঘোষণা করে উঠলো। এইভাবে নানাসাহেবের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিপ্লবীরা যে যার স্বতন্ত্রভাবে বিপ্লব ঘোষণা করে উঠলো এবং তার ফলে চেষ্টা সঙ্ঘবদ্ধ না হওয়ার পরিণামে তারা পরাজিত হয়ে গেল। কিন্তু সেই বিপ্লবীদেরও পরাজিত করতে ইংরেজদের হিমসিম

খেয়ে যেতে হয়। বিপ্লবীদলের সমর-নায়ক তান্তিয়া টোপী আর ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের বীরত্ব এবং রণকৌশলে সমর-অভিজ্ঞ বড় বড় ইংরেজ জেনারেলরাও অসহায় হয়ে পড়ে।

সিপাহীদের দমন করে ইংরেজরা বুঝেছিল, এ দেশের লোকদের ঠাণ্ডা করে রাখবার জন্যে তাদের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করবার একটা সুযোগ দিতে হবে। সেই জন্যে তারা ঘোষণা করলো, ভারতবাসীদের ক্রমশঃ শিক্ষিত করে তুলে ধীরে ধীরে দফায় দফায় তাদের শাসন ক্ষমতা দেওয়া হবে। এই ঘোষণার ফলেই সৃষ্ট হয়, ইংরেজ রাজনীতির চরম পরিণাম, ক্রমিক স্বায়ত্ত-শাসন। এবং দেশীয় লোকদের মধ্যে সেই রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার করবার জন্যেই ইংরেজ গভর্নরদের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পত্তন হয়। সেই প্রথম কংগ্রেস হয় বম্বে শহরে এবং তার সভাপতি হন বাঙালী ডবলু. সি. ব্যানার্জী।

তখনকার কংগ্রেসে ইংরেজ রাজকর্মচারীরাও যোগদান করতেন। বড়াদনের ছুটির সময়, দেশের ইংরেজী শিক্ষিত ধনী লোকেরা এই কংগ্রেসে সমবেত হতেন এবং দেশের ছোটখাট অভাব-অভিযোগের কথা কতকগুলি প্রস্তাব করে সরকার বাহাদুরের কাছে নিবেদন করতেন।

কংগ্রেসের সেই রাজনৈতিক বিলাসিতা ভেঙ্গে তিলক ও শ্রীঅরবিন্দ স্পষ্ট করে ঘোষণা করলেন, ভারতবর্ষ হলো ভারতবাসীর জন্যে এবং কংগ্রেসের লক্ষ্য হলো ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। এই তেজস্বী আত্মপ্রকাশে ইংরেজ-সরকার আতঙ্কিত হয়ে তাঁদের দমন করবার জন্যে অত্যাচার আর নির্যাতনের বাঁধ খুলে দিলো। কিন্তু তাতে উল্টা ফলই হলো। শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেস থেকে সরে এসে গোপনে বিপ্লবী দল গঠন করলেন, সেই দলের উদ্দেশ্য হলো সশস্ত্রভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘোষণা করা।

শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' কাগজে স্বাধীনতার বাণী ছড়াতে লাগলেন। 'বন্দেমাতরম্' ছিল ইংরেজী কাগজ। বিপ্লবীরা বাংলাভাষায় 'যুগান্তর' বার করে বিপ্লবের বাণী ও তত্ত্ব প্রকাশ করতে লাগলো। ইংরেজ সরকার এই সব

কাগজ বন্ধ করে দিলেন। যুগান্তরের বিপ্লবীদের মধ্যে থেকে ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়লেন। প্রফুল্ল চাকী পুলিসের হাতে ধরা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের রিভলভারে আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। কিন্তু ফাঁসির ভয় সেই তরুণকে এতটুকু বিচলিত করতে পারে নি। তিনি নিজের হাতে ফাঁসির দড়ি নিজের গলায় পরে নিলেন।

ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের সন্ধান পেয়ে যায় এবং শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অনুচর সমেত কারারুদ্ধ হন। সেই ঐতিহাসিক বিচারে বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে ব্যারিষ্টার দাঁড়ান, চিত্তরঞ্জন দাশ। এই মামলায় চিত্তরঞ্জন যে ভাবে ওকালতী করেছিলেন তাতে তাঁর নাম সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই দিন থেকে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি বিপ্লবীদলের অন্যতম প্রধান আশ্রয় ছিলেন, পরে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে বিপ্লব-আদর্শ পরিত্যাগ করে অহিংস-অসহযোগ নীতি গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশে ১৯০৫ সালে যে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ সেই আন্দোলনের প্রধান পুরোহিতরূপে সঙ্গীতে, সুরে, কবিতায়, সাহিত্যের প্রত্যেক অঙ্গে, এক নতুন সুর জাগিয়ে তুল্লেন। তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্পর্শে বাংলাভাষায় অমর অগ্নি শক্তি জেগে উঠলো। শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাস আর বক্তৃতা থেকে তিনি দেশের লোকদের প্রত্যেক কাজে, শিল্প-উন্নতিতে, শিক্ষা-সংস্কারে এবং পল্লী-উন্নয়নে নবদীক্ষা দিলেন এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে তিনি নিজে হাতে-কলমে কাজ করতে ব্রতী হলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পূর্ব আর পশ্চিম একদিন জ্ঞানের ক্ষেত্রে মিলিত হবে এবং পূর্বকেই প্রস্তুত হতে হবে জগৎকে সেই মহৎ জ্ঞানের দীক্ষা দেবার জন্যে। তারই জন্যে তিনি সৃষ্টি করেন 'বিশ্ব-ভারতী', যেখানে আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা প্রত্যক্ষভাবে ভারত-আত্মার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন।

স্বদেশী-আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রভাব সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে এবং যতীন মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু প্রভৃতি বিপ্লবী নায়কদের আজীবন চেষ্টায়

ফলে সারা ভারতবর্ষে গোপন বিপ্লবী দল গড়ে উঠতে থাকে। মহারাষ্ট্রের বীর সাভারকর 'অভিনব ভারত' নামে বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন।

কিন্তু এই সমস্ত খণ্ড খণ্ড বিপ্লব-চেষ্টা ইংরেজ কঠোর নির্যাতন, কারাবাস আর মৃত্যুদণ্ডের সাহায্যে দমন করে। বহু স্বদেশপ্রেমিক তরুণ-যুবা সেই বিপ্লবের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরলো কিন্তু দেশের দুর্দশার এতটুকুও পরিবর্তন ঘটলো না।

সেই সময় ভারবর্ষের রাজনীতি-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন মহাত্মা গান্ধী, এক সম্পূর্ণ নতুন আদর্শ নিয়ে। মহাত্মা গান্ধী অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করলেন। কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজালেন, নেতৃত্বের এক নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করলেন।

এতদিন ভারতবর্ষে যেসব রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে, তার সঙ্গে জন-সাধারণের কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। তারই জন্যে সেই সব আন্দোলন কিছুদূর গিয়েই আপনা থেকে থেমে যেতো। ভারতবর্ষের যে বিরাট জনতা এতদিন নিশ্চেষ্ট নিষ্প্রাণ উদাসীন হয়ে পড়েছিল, অসহযোগ-আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী সেই বিরাট জনতাকে দেশ-সচেতন করে তুল্লেন। হিমালয় থেকে কন্যা-কুমারিকা পর্যন্ত এই বিরাট দেশ এক প্রাণ হয়ে জেগে উঠলো।

এতদিন যেসব রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে, তা শুধু বড় বড় শহরেই আবদ্ধ থাকতো। মহাত্মা গান্ধী অপরূপ কৌশলে সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনকে শহর থেকে গ্রামে নিয়ে গেলেন। তিনি লবণ আইন-ভঙ্গ করতে যখন দেশ-বাসীকে আহ্বান করলেন, তখন সে আহ্বান দেশের দরিদ্রতম লোকের কাছে, সুদূরতম গ্রামের লোকের কাছে গিয়ে পৌছল। গান্ধীজী ভারতব্যাপী বিরাট গণ-চেতনা জাগিয়ে তুল্লেন, তার কাছে ইংরেজ মাথা নত করতে বাধ্য হলো।

অবশ্য ইংরেজ যে এত শীগ্‌গির, ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হলো, তার জন্যে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন ছাড়াও আর একজন অনন্যসাধারণ ভারতীয়ের জীবন-সাধনাও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। সে ভারতীয় হলেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর অহিংসবাদ পরিত্যাগ করে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্যে যে

বিস্ময়কর আয়োজন করেন, বিপ্লবের ইতিহাসে সে রকম রোমাঞ্চকর কাহিনী বিরল বল্লেই হয়। ইংরেজদের সদাজাগ্রত সতর্ক প্রহরীদের হাজার হাজার চোখ এড়িয়ে বন্দীদশা থেকে এই বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠ কিভাবে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ একাকী অবস্থায় বিশ্বজগতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিদের মধ্যে নিজের স্থান করে নেন, কিভাবে সহায়-সম্বলহীন অবস্থা থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিস্ময়কর সেনামণ্ডলী গড়ে তোলেন, এবং জগতে প্রথম স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের পত্তন করেন, তার রোমাঞ্চকর কাহিনী আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরের প্রিয়তম সম্পদ।

নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনী যদিও যুদ্ধে পরাজিত হয়, কিন্তু তাঁর অসামান্য শৌর্য-বীর্যের আদর্শ সমস্ত ভারতবাসীকে এক নতুন শক্তিতে উদ্দীপ্ত করে তোলে এবং আজাদ-হিন্দ বাহিনীর বিদ্রোহ-বহ্নি ধীরে ধীরে ইংরেজ শাসনাধীন দেশীয় সেনামণ্ডলীতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ইংরেজ যখন দেখলো, একে একে ক্রমশঃ সমস্ত দেশী সামরিকবাহিনীতে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ছে, তখনই কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ, নিষ্পত্তি করতে বাধ্য হয় এবং একদা ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট কংগ্রেসের ওপর ভারতবর্ষের শাসন-ভার প্রত্যর্পণ করে ভারতের তীরভূমি থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়! শেষ হয়ে যায় ইতিহাসের এক অধ্যায়।

সেই ১৫ই আগষ্ট থেকে ভারতবর্ষে শুরু হয়েছে, ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। স্বাধীন ভারতবর্ষ আজকের এই ভেদ আর হিংসা কণ্টকিত পৃথিবীতে তার নিজের স্থান অধিকার করে নিতে অগ্রসর হয়েছে। তার সামনে একমাত্র লক্ষ্য হলো, ভারতের দারিদ্র্য ও অশিক্ষা দূর করা এবং বিশ্বজগতে শান্তির, মিলনের, কল্যাণের পথপ্রদর্শক হওয়া। ভারতবর্ষ যত দরিদ্র হোক্, তার অন্তর সম্পদের ঐশ্বর্যে সে বিশ্বের রিক্তপ্রাণকে একদিন পূর্ণ করে তুলবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভারতের মহাকবির ভবিষ্যৎ-বাণীকে সফল ক'রে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরেই একদিন বিশ্ব এসে মিলিত হবে।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। ক) সিপাহী-বিদ্রোহের পরিকল্পনা, অভ্যুত্থান ও নায়কদের সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

খ) কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর হইতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২। ক) স্বাধীনতা আন্দোলনে তিলক ও অরবিন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেন ?
 খ) প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম কিজন্য অবিস্মরণীয় হইয়া আছেন ?
 গ) স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা কি ছিল ?
 ঘ) মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য কি ছিল ?
 ঙ) 'আর একজন অনন্যসাধারণ ভারতীয়ের জীবন-সাধনাও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে'—এই ভারতীয় কে ? ইংরেজ-বিতাড়নের জন্য তিনি কি করিয়াছিলেন ?

৩। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :—
 ক) সূর্য অস্ত যাওয়ার……থেকে পলায়ন করেন।
 খ) যেখানে আজ বিশ্বের……সুযোগ পেয়েছেন।
 গ) এই বিরাট……প্রাণ হয়ে জেগে উঠলো।
 ঘ) তার অন্তরসম্পদের……পূর্ণ করে তুলবে।

৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—
 ক) অপূর্ব চরিত্র ছিল — যাঁর।
 খ) — তাদের গোপন কেন্দ্র আর বোমা তৈরীর কারখানা প্রতিষ্ঠা করলো।
 গ) — সম্পূর্ণ নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজালেন।
 ঘ) শেষ হয়ে যায় — এক অধ্যায়।

৫। ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর :—
 ক) ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আমরা ইংরেজদের অধীন হই।
 খ) আজিমুল্লাহ্ গোপনে নানা সাহেবকে য়ুরোপে পাঠিয়েছিলেন।
 গ) সম্পাদক হন বাঙালী ডবলু. সি. ব্যানার্জী।
 ঘ) মহারাষ্ট্রে ১৯০৫ সালে যে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।
 ঙ) নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনী যদিও যুদ্ধে জয়ী হয়।

৬। পেশওয়া, মঙ্গলপাণ্ডে, তিলক, বিশ্বভারতী, কন্যা-কুমারিকা, আজাদ-হিন্দ-বাহিনী—সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ভারতের স্বাধীন
আন্দোলনের ইতিহাস - সংগ্রামী - নেহে[illegible]
অহিংস আন্দোলন এবং নেতাজী [illegible]
[illegible] বিপ্লব-আন্দোলনের
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস - এই প্রবন্ধে [illegible]



মংপুতীর্থে

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

বহুদিন আগে কবিগুরু যখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মাঝে মাঝে এসে থাকতেন, আমি তখন পার্বতী ঘোষের লেনে থাকি। তিনি প্রায়ই দুপুরে কাউকে পাঠিয়ে ডেকে নিয়ে যেতেন—কেবল গল্প করবার জন্যই, সেই সময়ই শুনতে পেতাম মংপুর গল্প। সে নাকি এমন চমৎকার জায়গা, যেখানে গেলে আর ফিরে আসবার ইচ্ছা হয় না। অনেকবার বলেছেন—'পারো তো একবার মংপুতে যেয়ো, সে যা জায়গা, গেলে অ-কবিরও কবি হতে ইচ্ছা হবে।'

সেই মংপুতে—বহুকাল পরে সেদিন মাত্র গিয়েছি।

শিলিগুড়ি হতে মংপু, কি ভীষণ পথ তা বলার নয়। আমরা কয়জন মোটরে ছিলাম।

সেভক রোড দিয়ে যেতে বাঁয়ে খাড়া উঁচু পাহাড়, দক্ষিণে তিস্তা—বহু নিচে তার জল দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণে সেভক ব্রীজ (করোনেশান ব্রীজ)। ওপারেও পর্বতশ্রেণী চলেছে, তার গা ঘেঁষে এঁকে বেঁকে চলেছে পথ। শিলিগুড়ি হতে প্রায় সতেরো আঠেরো মাইল দূরে এই ব্রীজ, অতি চমৎকার দেখাচ্ছে।

সেভক ব্রীজ ছাড়িয়ে এঁকে বেঁকে পাহাড়িয়া পথ বেয়ে মোটর চললো। দশটা পাঁচ মিনিটে যাত্রা করে বহু অভীপ্সিত মংপুতে গিয়ে পৌছালাম বারোটা

চল্লিশ মিনিটে। মাঝে 'রোমবি' নামে একটি বাজার,—এখান হতে একটা পথ গিয়েছে কালিম্পং গ্যাংটকের দিকে, দ্বিতীয়টি এসেছে মংপুতে। সমস্ত আসাম অঞ্চল দেখা হয়েছে; পথের এ ভীষণতা আর কোনদিন দেখিনি। পথের কুড়ি হাত দূরে দূরে বাঁক, ওদিকে কি আছে এদিক হতে কিছু দেখা যায় না, ড্রাইভার অনবরত হর্ণ দিচ্ছে। প্রতিপদে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে—এই বুঝি বাঁক ফিরতে একেবারে অতল তলে প্রস্তরময় তিস্তার বুকে গড়িয়ে পড়তে হয়। মংপু যেতে 'সিমলা' নামে একটি স্থান দেখলাম। এখান হতে ছবির মত মংপুকে উপরে দেখা যায়।

অনেকখানি ভয় দুর্ভাবনা নিয়ে পৌছালাম মংপুতে।

দূর হতে দেখাচ্ছে যেন একখানি ছবি। কুইনোলজিষ্টের বাংলোয় উঠলাম আমরা, তাঁকে খবর দেওয়া ছিল।

ফুলে ফুলময় বাংলো। শুনলাম সমতল ক্ষেত্র হতে চার হাজার ফুট উঁচুতে মংপু। সিঙ্কোনার চাষ হয় এখানে এবং এই অফিসেই মাত্র তিন চার জন বাঙ্গালী কাজ করেন এবং পরিবার সহ মংপুতে থাকেন। শ্রমিকদের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত একজন ডাক্তারও এখানে থাকেন। যারা কারখানায় কাজ করে, তারা সবই প্রায় এই অঞ্চলের লোক।

এই পাহাড়ের উপর মাছ দুষ্প্রাপ্য, যেদিন শিলিগুড়িতে গাড়ি যায় সেই দিনই যা মাছ আসে, এখানে মাংসও প্রায় মেলে না। ছোট ছোট সবজির বাগানে দেখলাম বাঁধাকপি, গাজর, বিট প্রভৃতি নিত্যকার সবজি।

বৈকালের দিকে আমরা যে বাড়িতে কবিগুরু মাঝে মাঝে এসে বাস করতেন, বহু অভীপ্সিত সেই বাড়ি দেখতে গেলাম।

স্মৃতি-ফলকটি প্রথম চোখে পড়ে, তার আধখানা ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু সংস্কার হয়নি। শুনলাম গভর্ণমেণ্ট এই বাড়িটি নিয়েছেন জনসাধারণের জন্য।

চারিদিকে নাশপাতি, কমলা প্রভৃতি ফলের বড় বড় গাছ, পাশেই তাঁর উপাসনা মন্দির, প্রতি বৎসর নূতন করে খড় দিয়ে ছাওয়া হয়। বাড়ির সামনে খানিকটা সমতলক্ষেত্র, সরু লম্বা দুতিনখানি কাঠ বেঞ্চের মত দেওয়া আছে। যে

ভদ্রলোক আমাদের দেখানোর ভার নিয়েছিলেন—তিনি ভিন্নদেশী এবং এখানকার দায়িত্ব তাঁর উপর। তিনি ইংরাজীতে জানালেন কবিগুরু এখানে বসতেন। সামনের দিকে দুরারোহ পর্বত শ্রেণী; এখানে বসে সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে সত্যই অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। কবিগুরু সত্যই বলেছিলেন—"মংপুতে গেলে তুমি অনেক কিছু পাবে—বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাবে, তাই বলছি—তুমি যেয়ো।"

বাইরে পাদুকা খুলে সসম্ভ্রমে দেবমন্দিরে পূজারিণীর মতই সে মন্দিরে প্রবেশ করলাম।

কবির খাটে আজও শয্যা আস্তৃত,—দেয়ালে কয়েকটি পুরাতন ছবি, তাঁর ব্যবহৃত কতকগুলি জিনিস। এরপর পাশের ঘরে গেলাম—কত বৎসর আগেকার পত্রিকাগুলি বিবর্ণ হয়ে গেলেও আজও রয়েছে। মংপুতেও কবির কাছে নিত্যকার সংবাদপত্র পৌছেছে, প্রায় অজ্ঞাতবাস হলেও দুনিয়ার খবর তাঁর কাছে অজ্ঞাত ছিল না।

সরু লম্বা টিনের কয়েকটা কৌটার মত পাত্র দেখলাম, কবির লেখা এর মধ্যে থাকতো, উপস্থিত সবগুলি শূন্য পড়ে আছে। কবির ব্যবহৃত কতকগুলি ঔষধের শিশি (বায়োকেমিক) আজও র‍্যাকের উপর সাজানো আছে।

এই বাড়িটির পিছনের অংশে খেলাধূলা হয়। লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছে,—এগুলি সাধারণের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছে। সেদিকেও গিয়েছি, কিন্তু মন ফিরে এলো সেই ঘরে—যেখানে কবি বসে লেখাপড়া করতেন, যেখানে তিনি বেড়াতেন। একপাশে বাথরুম,—তাঁর পরিধেয় রাখবার র‍্যাক।

ভিতরকার ফটো তোলা সম্ভব হয়নি। ভিজিটর বুকে নাম ঠিকানা লিখতে গিয়ে দেখলাম বহু-বহু লোক এই পবিত্র তীর্থ-নীরে অবগাহন করে পুণ্য পবিত্র-পরিশুদ্ধ হয়ে ফিরে গেছেন। তাঁদের মধ্যে আমিও একজন—তাই সশ্রদ্ধায় নাম লিখলাম।

ভক্তিনম্র চিত্তে বারবার মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করলাম—"গুরু, আমি এলাম—কিন্তু অনেক পরে।"

কবিগুরুর বড় প্রিয়স্থান, শেষ শয্যায় শয়ন করে তিনি বার বারই জানিয়েছিলেন—মংপুতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হোক, তিনি সেখানে ভালো হয়ে উঠবেন।

কিন্তু তাঁর বড় প্রিয় মংপুতে তিনি আর ফিরে যেতে পারেন নি।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। নিজ ভাষায় মংপু-ভ্রমণের কাহিনীটি লিখ।

২। ক) 'সে যা যায়গা, গেলে অ-কবিরও কবি হতে ইচ্ছা হবে।'—কে বলিতেন এই কথা? কোন্ জায়গার কথা বলিতেন? কেন বলিতেন?

খ) 'প্রায় অজ্ঞাতবাস হলেও দুনিয়ার খবর তাঁর কাছে অজ্ঞাত ছিল না'—কাহার কথা বলা হইয়াছে? কোথায় অজ্ঞাতবাসে ছিলেন তিনি? অজ্ঞাতবাস বলিবার কারণ কি?

গ) 'তাই সশ্রদ্ধায় নাম লিখলাম'—কে, কোথায় নাম লিখিলেন? কেন সশ্রদ্ধায় নাম লিখিলেন তাহা লিখ।

৩। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :—

ক) মংপুতে গেলে তুমি……তাই বলছি—তুমি যেয়ো।

খ) গুরু, আমি এলাম……অনেক পরে।

৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

ক) মাঝে — নামে একটি বাজার।

খ) শুনলাম গভর্নমেণ্ট এই বাড়িটি নিয়েছেন — জন্য।

গ) বহু-বহু লোক এই পবিত্র — অবগাহন করে পুণ্য পবিত্র-পরিশুদ্ধ হয়ে ফিরে গেছেন।

৫। ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর :—

ক) 'সিমলা' যেতে মংপু নামে একটি স্থান দেখলাম।

খ) প্রতি বৎসর নূতন করে খড় দিয়ে ছাওয়া হয় না।

গ) মংপুতেও কবির কাছে নিত্যকার সংবাদ পৌছয়নি।

৬। টীকা লিখ :—কুইনোলজিষ্ট, বায়োকেমিক, ভিজিটর-বুক।

মংপুর শৈলাবাস রবীন্দ্রনাথের অন্যতম
স্মৃতিচারণ করেছেন লেখিকা প্রবোধী দে
সকলুই।



শ্রীঅরবিন্দ

শঙ্করনাথ রায়

আধুনিক ভারতের ধর্মজীবনে বাংলার হুগলি জেলার অবদান প্রায় অতুলনীয়। রামমোহন, রামকৃষ্ণ ও অরবিন্দ,—ভারতের এই তিন ধর্মনেতাকে হুগলি এক শতাব্দীর মধ্যে উপহার দিয়েছে। কোন্নগর এই জেলারই এক ক্ষুদ্র জনপদ। এখানকার প্রসিদ্ধ কায়স্থ বংশে ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের গৃহে অরবিন্দ আবির্ভূত হন।

মনীষী ও মহাপ্রাণ সমাজনেতা রাজনারায়ণ বসুর কন্যা স্বর্ণলতাকে ডাঃ ঘোষ বিবাহ করেন। আর এই ঘোষ দম্পতির তৃতীয় সন্তানরূপে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট অরবিন্দ ভূমিষ্ঠ হন।

কৃষ্ণধন ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষায় বিশ্বাসী। তাই অরবিন্দকে পাঁচ বছর বয়সে দার্জিলিং-এর এক ইংরেজী স্কুলে পাঠালেন। শুধু তাই নয়, অরবিন্দের বয়স যখন মাত্র সাত বছর, তখনই অপর দুই ভাইয়ের সঙ্গে ইংলণ্ডে পাঠানো হলো তাঁকে।

অসাধারণ প্রতিভা ও মেধা এই বালকের। বাল্যকালেই ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন তিনি। তারপর ইতালীয় ও জার্মান ভাষায়। কেম্ব্রিজের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পেলেন, ভর্তি হলেন কিংস কলেজে। ঐ বছরই অর্থাৎ আঠারো বছর বয়সে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

মেধাবী তরুণ ঐ পরীক্ষায় গ্রীক ও লাটিন ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন। দু'বছর বেশ দক্ষতার সঙ্গে সিভিল সার্ভিসের শিক্ষানবিশী করলেন অরবিন্দ। কিন্তু অশ্বারোহণ পরীক্ষার দিন দেখা গেলো, তিনি অনুপস্থিত। সিভিল সার্ভিসের কাঠামোর মধ্যে এই মহাজীবনকে বন্দী করে রাখা গেলো না। তিনি এড়িয়ে চলে গেলেন। অথচ দুঃসাহসিক অরবিন্দের কাছে ঘোড়ায় চড়া একটি তুচ্ছ ব্যাপার। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিভিল সার্ভিসের শ্রীযুক্ত চারুদত্ত লিখেছেন: অরবিন্দ সেদিন আমার বাংলোর এসেছেন। বারান্দায় বসে তখন বন্দুক নিয়ে হৈ-হল্লা হচ্ছে। অরবিন্দকে বন্দুক চালাবার জন্য আহ্বান জানানো হলো। অভ্যাস নেই বলে প্রথমটা তিনি কিছু আপত্তি করলেন। শেষে বন্দুক ধরলেন। অবশ্য সামান্য একটু দেখিয়ে দিতে হলো। তারপর তিনি বারবার লক্ষ্য ভেদ করতে লাগলেন। লক্ষ্যবস্তু কি? না—দেশলাই কাঠির ছোট্ট মাথাটা। ও রকম লোকের যোগসিদ্ধি হবে না তো কি তোমার আমার হবে?

অরবিন্দ ভারতে ফেরেন বরোদা ষ্টেটের কাজ নিয়ে। মাতৃভাষায় জ্ঞান তাঁর তখন নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু নিজের দেশ, নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে জানার অদম্য আগ্রহের জন্য তিনি অল্পকালের মধ্যেই ভারতাত্মার মর্ম উপলব্ধি করতে সমর্থ হলেন। প্রাচীন ভারতের কাব্য, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হলো। এগিয়ে চললো ভবিষ্যৎ দেশনেতা ও লোকগুরুর আত্ম প্রস্তুতি। এ সময় অরবিন্দ রামায়ণ ও মহাভারতের কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করেছিলেন।

গোড়ার দিকে অরবিন্দ বরোদা ষ্টেটে রাজস্ব বিভাগে কাজ করতেন। পরে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা থেকে ক্রমে ভাইস প্রিন্সিপ্যালের পদে উন্নীত হন। এখানে থাকতেই মারাঠা কেশরী বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য হয় এবং এই সখ্য উত্তরকালে ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

বরোদায় থাকা কালে অরবিন্দ বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম মৃণালিনী দেবী। সংসারধর্মে তিনি কিন্তু চির উদাসীন ছিলেন। সহধর্মিণী মৃণালিনী স্বামীর ব্রত উদযাপনে সহায়তা করেন।

বরোদা-জীবনের শেষ পর্যায়ে অরবিন্দের মানসে এক সুস্পষ্ট বিবর্তন দেখা যায়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ তাঁর ভবানী মন্দিরের পরিকল্পনা রচনা করেন। এ বিষয়ে একটি পুস্তিকাও তিনি প্রকাশ করেন। স্থির হয়, দেশের দিকে দিকে মায়ের মন্দির স্থাপিত হবে, তার সঙ্গে থাকবে তরুণ কর্মযোগীদের আশ্রম। এই আশ্রমের কর্মীরা চারিদিকের জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং গঠনমূলক কাজে ব্রতী হবে। সেই সঙ্গে সামরিক সংগঠন ও যোগাভ্যাসও চলবে। প্রথমটায় নর্মদাতীরে গঙ্গোনাথ আশ্রমে, তারপর কলকাতার মুরারিপুকুরের বাগানে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়।

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের এক নূতন অধ্যায় উন্মোচিত করে। সারা ভারতবর্ষ এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জেগে ওঠে। অরবিন্দও দেশের ডাকে সাড়া দিলেন এবং বরোদা ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিক্ষোভ চঞ্চল বাংলার কর্মক্ষেত্রে। গোড়ার দিকে বাংলার যে জাতীয় শিক্ষাপরিষদ গঠিত হয়েছিলো, যার উদ্দেশ্য ছিলো ইংরেজ সরকার পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে জাতীয় আদর্শে শিক্ষাকে গড়ে তোলা,—তার অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করলেন অরবিন্দ। কিছুদিন পরেই তাঁর ডাক পড়লো, তিনি এগিয়ে এলেন সংগ্রামের পুরো ভাগে। মুক্তিমঞ্চের পুরোধারূপে চিহ্নিত হলেন।

'বন্দেমাতরম' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে লাগলো। অরবিন্দ হলেন তার সম্পাদক। তাঁর লেখনী নিঃসৃত বাণী দেশ-বাসীকে উদ্বুদ্ধ করলো, মুক্তি সংগ্রামের চিন্তাধারায় এনে দিলো বিপ্লব। প্রকাশ্য সুস্পষ্ট ভাষায় অরবিন্দই প্রথম ঘোষণা করলেন পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ। নবীন ভারতের অন্যতম চিন্তানায়ক ও রাজনৈতিক নেতারূপে অরবিন্দের আবির্ভাব ঘটে।

বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ রাজশক্তি এই শক্তিধর নেতাকে চূর্ণ করার জন্য সচেষ্ট হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে বন্দেমাতরম পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধের জন্য সম্পাদক অরবিন্দকে জেলে যেতে হয়। সারা দেশময় এ নিয়ে চাঞ্চল্য পড়ে যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ই তাঁর প্রশস্তি গান করে বিখ্যাত কবিতায় লেখেন:

—অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!

দ্বিতীয়বার তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিখ্যাত আলিপুর বোমায় মামলায় তাঁর বিচার আরম্ভ করেন ব্রিটিশ সরকার। প্রতিভাবান কৌসুলী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বিচারের সময় অরবিন্দ সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'এই বিতণ্ডা, কোলাহল ও আন্দোলন স্তব্ধ হবার বহুকাল পরে, এঁর অন্তর্ধানের দীর্ঘকাল পরে, মানব সমাজ এঁকে স্বদেশ প্রেমের মহাকবি, জাতীয়তার প্রবর্তক ও মানবপ্রেমিক বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে, এঁর তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে এঁর বাণী, শুধু ভারতবর্ষে নয়, সাগর-পারের দূরদূরান্তে ধ্বনিত হতে থাকবে।'

উত্তরকালে চিত্তরঞ্জনের এই উক্তি সত্য হয়ে ওঠে। আলিপুর জেলে আটক থাকার সময় অরবিন্দের জীবনে এক অলৌকিক অনুভূতি আত্মপ্রকাশ করে। তিনি নিজে এর বর্ণনা দিয়েছেন : 'এইখানে এই ক্ষুদ্র ঘরের দেওয়ালটি আমার সঙ্গী, নিকটে আসিয়া ব্রহ্মময় হইয়া ইহা আমাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত। উদ্যানের দেওয়ালের গায়ে একটি বৃক্ষ ছিলো, তাহার নয়নরঞ্জক সবুজ লাবণ্যে প্রাণ জুড়াইতাম। ঘরের সামনে যে শান্ত্রী ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার মুখ ও পদশব্দ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো প্রিয় বোধ হইত। আলিপুরের নির্জন কারাবাসে আমি অপূর্ব প্রেমশিক্ষা পাইলাম।'

কংসের কারাগারে ভগবান বাসুদেব ভূমিষ্ঠ হন। আর সেদিন ইংরেজের বন্দীশালায় অরবিন্দের জীবনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সেই বাসুদেবের চৈতন্যময় সত্তা। কারাগারে অরবিন্দ যে বাণী শুনেছিলেন তার মধ্যে একটি হলো,—যখন তুমি বাইরে যাবে তোমার জাতিকে সর্বদা এই বাণীটি শোনাবে যে, সনাতন ধর্মের জন্যই তারা উঠছে, নিজেদের জন্য নয়—সমস্ত জগতের জন্যই তারা উঠছে। আমি তাদের স্বাধীনতা দিচ্ছি জগতের সেবার জন্য।

কারাগার থেকে মুক্তি পাবার পর অরবিন্দ কর্মযোগিন্ ও ধর্ম এই দুইটি সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। বাইরে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লব, অন্তরের মধ্যেও তেমনি চলতে থাকে আর এক বিপ্লব। কিছু দিন পর কলকাতার চাঞ্চল্য থেকে সরে গিয়ে তিনি চন্দননগরে আত্মগোপন করেন। তারপর ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে পরামর্শের পর 'সি-আই-ডি'দের চোখে ধুলো দিয়ে উপস্থিত হলেন পণ্ডিচেরীতে। সেটা ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা

এপ্রিল। সেখানেই শুরু হয় তাঁর জীবনের অতি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। বাকি জীবন সেইখানে তিনি রইলেন এবং গড়ে তুললেন বিখ্যাত আশ্রম।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর সমাগত হয় শক্তিধর মহাপুরুষের মহাসমাধির লগ্ন। মরদেহ ত্যাগ করে অরবিন্দ দিব্যলোকে অন্তর্হিত হলেন। মুক্তির যে সাধনা প্রথম জীবনে তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, মানবাত্মার পরম মুক্তির পথে সেই সাধনারই সেদিন ঘটে মহা উত্তরণ। বঙ্কিম ও বিবেকানন্দই দেশ মাতৃকার মধ্যে সর্বপ্রথম দেবীত্বের আরোপ করেন। কিন্তু এই তত্ত্বকে জনচৈতন্তে তুলে ধরেন অরবিন্দ। অরবিন্দের সাধনা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়—জগন্মাতা আর দেশমাতায় ভেদ নেই। রাজনীতিতে আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রয়োগের দিক দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ অবতীর্ণ হন এক পথিকৃৎরূপে।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। শ্রীঅরবিন্দের জীবনের কথা যাহা জান নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখ।

২। ক) 'ওরকম লোকের যোগসিদ্ধি হবে না তো কি তোমার আমার হবে?'—কাহার প্রসঙ্গে এই কথা বলা হইয়াছে? এই উক্তির পিছনের কাহিনীটি লিখ।

খ) 'মুক্তিমঞ্চের পুরোধারূপে চিহ্নিত হলেন'—কাহার কথা বলা হইয়াছে? কোন সময়ের ঘটনার কথা বলা হইয়াছে?

গ) আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দের পক্ষে কৌঁসুলী ছিলেন কে? তিনি শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে কি বলিয়াছিলেন?

৩। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :—

ক) তিনি অল্পকালের মধ্যেই……করতে সমর্থ হলেন।

খ) এইখানে এই ক্ষুদ্র ঘরের……আলিঙ্গন করতে উদ্যত।

গ) মুক্তির যে সাধনা……সেদিন ঘটে মহা উত্তরণ।

৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

ক) — খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট অরবিন্দ ভূমিষ্ঠ হন।

খ) গোড়ার দিকে অরবিন্দ বরোদা ষ্টেটে — বিভাগে কাজ করতেন।

গ) — নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে লাগলো।

৫। ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর :—

ক) মাতৃভাষায় জ্ঞান তাঁর তখন নিতান্ত নগণ্য নয়।

খ) তার অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করলেন না অরবিন্দ।

গ) সেটা ১৯০১ সালের ৪ঠা এপ্রিল।

৬। টীকা লিখ :—

রাজনারায়ণ বসু, সিভিল সার্ভিস, তিলক, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, চিত্তরঞ্জন দাশ।



বিষে বিষক্ষয়

বিশ্বনাথ রায়

সারা লণ্ডন শহর শ্মশান হয়ে গেছে। রাস্তায় লোক নেই, সন্ধ্যের পর রাস্তায় আলো নেই। কে আলো জ্বালবে? সবাই বসন্তের আক্রমণে বাড়িতে পড়ে আছে। যারা সুস্থ তারা শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। অন্ধকারে ঢাকা সমস্ত শহর। ঘর থেকে কেবল অসুস্থের কাতরধ্বনি জানালা দিয়ে ভেসে আসছে। রাস্তায় দু-একটা কুকুর তারস্বরে চিৎকার করছে।

শুধু একটি লোক চলেছেন দীর্ঘ পদক্ষেপে। তাঁর পায়ের শব্দে ভয় পেয়ে পথের কুকুর ডাক থামিয়ে মুখ তুলে দেখছে কে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে? এ কি মানুষ?

ভদ্রলোক চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে একটা বাড়ির দিকে তাকালেন। বাড়ির জানালা দিয়ে আলোর রেখা বেরিয়ে আসছে। তাঁর ভ্রূ কুঁচকে গেল। একটু থেমে সেই বাড়ির দিকে হেঁটে চললেন। দরজার সামনে এসে টকটক করে টোকা দিলেন। কোন সাড়া নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার টোকা দিলেন। ভিতর থেকে দরজা খোলার শব্দ হল আর দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়ালেন এক ভদ্রমহিলা। বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। মুখে একটা স্বর্গীয় ভাব।

—'আপনি কে?' ভদ্রমহিলা পথচারীকে প্রশ্ন করলেন বিস্মিতভাবে। 'কেন এই সময়ে পথে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন?'

পথচারী গম্ভীর অথচ মিষ্টস্বরে বললেন, 'আমি ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনার।'

ভদ্রমহিলার মাথা ভক্তিতে নুয়ে পড়ল। ডাক্তার জেনার তখনকার দিনের

সবচেয়ে নামকরা আর দয়ালু ডাক্তার। মহামারীর ভয়ে যখন শহরের অন্যসব ডাক্তার চম্পট দিয়েছেন, তখন তিনি শহরতলী থেকে এসে শহরের ঘরে ঘরে চিকিৎসা করে বেড়াচ্ছেন। ঈশ্বরের দূতের মত আরোগ্যের আশ্বাস ঘরে ঘরে দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

—'আসুন। আসুন। কি সৌভাগ্য আমাদের।' ভদ্রমহিলা ডাক্তার জেনারকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানান। ঘরের মধ্যে ঢুকে ডাক্তার অবাক্ হয়ে গেলেন। ঘরের ভিতর সার সার নানা বয়সের রোগী শুয়ে। কেউ ছেলে, কেউ যুবতী, কেউ বৃদ্ধ, কেউ বা যুবক। সবাই বসন্তের আক্রমণে আক্রান্ত। একমাত্র এই ভদ্রমহিলাই সুস্থ শরীরে সকলের সেবা করে বেড়াচ্ছেন।

—'আপনি কে মা?' অবাক্ বিস্ময়ে ডাক্তার জেনার জিজ্ঞাসা করলেন।

ভদ্রমহিলা লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, 'আমি এ বাড়ির বউ! আমার ছেলে-মেয়েদের বসন্ত হয়েছে, সেই সঙ্গে পাশের বাড়িরও। ওদের কোথায় ফেলে দেব, তাই একসঙ্গে রেখে দিয়েছি।'

ডাক্তার জেনার ধীর কণ্ঠে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই দেবতার অংশে জন্মেছেন, তা নইলে সবাই যখন রোগগ্রস্ত, আপনি তখন কি করে এমন সুস্থ থাকেন?'

—'ঈশ্বরের আশীর্বাদ কিনা জানি না!' ভদ্রমহিলা বলতে আরম্ভ করেন, 'আমার বাপের বাড়ি পাড়াগাঁয়ে এবং আমাদের বাড়িতে অনেক গরু আছে। ছোটবেলায় দেখতাম গরুর বাঁটে বসন্তের মত একরকম রোগ হত। আমরা গরুর বাঁট নিয়ে খেলতাম। খেলা করতে করতে একদিন দেখলাম আমার আঙুলে গরুর বাঁটের ফোসকার মত ফোসকা হয়েছে। সেই ফোসকার দাগ এখনও হাতে আছে। তারপর থেকে কতবার বসন্ত কত লোকের হয়ে গেছে, কিন্তু আমার কখনও হয়নি।'

ডাক্তার জেনার ভদ্রমহিলার প্রত্যেকটি কথা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন, তারপর বললেন, 'চলুন মা রোগী দেখে যাই।'

রোগী দেখা শেষ করে ডাক্তার জেনার আবার অন্ধকার রাস্তায় মিলিয়ে গেলেন। অন্ধকারের ভিতর শুধু তাঁর পায়ের শব্দ শোনা যেতে লাগল খট্ খট্ খট্।

ডাক্তার জেনার রোজ এসে রোগীদের দেখে যান। ধীরে ধীরে সবাই সেরে উঠল। লণ্ডনে আবার লোক ফিরে আসতে আরম্ভ করল। আবার স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল। সবই স্বাভাবিক হল, কিন্তু অস্বাভাবিক হয়ে গেল ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনারের চরিত্র। অত গুরুগম্ভীর চরিত্র কোথায় মিলিয়ে গেল। শেষরাতে উঠে বসে থাকতেন কখন তাঁর গোয়ালিনী দুধ দিতে আসবে। শারা নিমীস্ তাঁর গোয়ালিনীর নাম। শারা এলেই জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার হাত দেখি শারা।'

অবাক্ হয়ে শারা তার হাত দুখানা ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে দেয়। ডাক্তার পরম আগ্রহে হাত দুটো পরীক্ষা করেন, কি দেখেন তিনিই জানেন। শারা ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারে না কিন্তু এক এক সময়ে ভাবে বলে দেই, ডাক্তারবাবু কি হাতের বিচার করছেন আজকাল ?

একদিন ভোরবেলায় শারার হাত দেখে ডাক্তার জেনার লাফিয়ে উঠে বললেন, 'শারা, এক্ষুনি তোমার বাড়ি যাব। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।'

অবাক্ হয়ে শারা বলে, 'এ কি কথা বলছেন। আমায় এখনও অনেক বাড়ি দুধ দিতে হবে, আমি চললাম।'

—'শারা!' ডাক্তারের গম্ভীর চিৎকার শুনে চমকে ঘুরে দাঁড়ায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। ডাক্তারের হাতে একটি খোলা ছোরা। এক পা এক পা করে এগিয়ে এসে ডাক্তার বললেন, 'আমার কথা না শুনলে, এটা তোমার বুকে আমূল বসে যাবে।'

—'ডাক্তারবাবু আপনি পাগল হয়ে গেছেন।' শারা ভয়ে চিৎকার করে ওঠে।

—'সে কথা পরে। কিন্তু এখন চল, আর দেরি করো না।'

কথা কাটাকাটি করতে শারার আর সাহস হয় না। নীরবে বাড়ির দিকে চলে, পিছনে ছোরা হাতে ডাক্তার।

শারার বাড়িতে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে ডাক্তার বললেন, 'গোয়ালঘর কোন্ দিকে ?'

শারা এবার সত্যিই ভড়কে যায়। ডাক্তার কি ক্ষেপে গেলেন নাকি ? তবু

ভয়ে ভয়ে ডাক্তারকে গোয়ালঘরের সামনে নিয়ে এল, তখন ডাক্তার বাঘের মত গর্জে উঠে বললেন, 'কোন্ গরুর দুধ তুমি নিয়ে গিয়েছিলে?'

ভয়ে কাঠ হয়ে গেল শারা। ডাক্তার নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছেন। কোন রকমে কাঁপতে কাঁপতে শারা গাভীটির কাছে গিয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে শুকনো মুখে বললো, 'এই গরুর।'

ডাক্তার জেনার সেখানেই মাটির ওপর বসে পড়লেন। গাভীর বাঁট নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন, কিছুক্ষণ পরে গম্ভীরভাবে বললেন, 'শারা তোমার হাত দেখি।'

অবাক্ বিহ্বল নারী তার হাতদুটো পাগলা ডাক্তারের সামনে এগিয়ে দিল। ডাক্তার শারার হাত গাভীর বাঁটের পাশে নিয়ে এসে আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'এই দেখ শারা তোমার হাতের মত গরুর বাঁটেও ফোসকা হয়েছে!'

হেসে ফেলে শারা বলল, 'এর জন্যে এত কাণ্ড! এ তো গোয়ালাদের মধ্যে হরদম হচ্ছে।'

ডাক্তার জেনার দাঁড়িয়ে উঠে পকেট থেকে একগোছা নোট শারার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'শারা তোমার হাতের ওই ফোসকাগুলোর মধ্যে যেই পুঁজ হওয়া আরম্ভ হবে, অমনি তোমাকে আমার দরকার।'

—'ফোসকার পুঁজ দিয়ে কি হবে?' শারা অবাক্ হয়ে যায়।

—'যদি সফল হই শারা, তাহলে ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনারের পাশে গোয়ালিনী শারা নিমীসের নাম চিরকাল লেখা হয়ে যাবে। আর একজনের নাম আমার দরকার শারা, যে মহীয়সী ভদ্রমহিলা আমাকে এ পথে ভাবার সুযোগ করে দিয়েছেন।'

—'কী ব্যাপার, আমায় বলবেন না ডাক্তার?' শারা মিনতি করে।

—'আজ নয়, সময় আসুক।' ডাক্তার জেনার বিদায় নেন।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে। জেনার লিখে যাচ্ছেন। আজ শারার ফোসকায় পুঁজ হয়েছে। এই সুযোগ। একটি বাপ-মা মরা ছেলে জেম্স্ ফিপ্স্, তাঁর কাছে এসে রয়েছে। তাকে দিয়েই পরীক্ষা করবেন। যদি সফল না হন?

যদি ছেলেটি মারা যায়? হে ঈশ্বর! যদি কোন পাপ হয় ক্ষমা কর। আমি যা করতে যাচ্ছি বিশ্বের কল্যাণের জন্যেই করছি।

ঠিক সময়ে শারা এল। ডাক্তার সাগ্রহে শারার হাত থেকে পুঁজ টেনে নিয়ে জেম্‌সের দেহে ঢুকিয়ে দিলেন। জেম্‌স্‌কে তিনি কোথাও বের হতে দেন না। সর্বদা নিজের কাছে রেখে দেন। পরের দিন বিকেলবেলা জেম্‌সের গা হাতে ব্যথা হয়ে জ্বর এল। তিনদিনের দিন ফোসকাগুলো টাটিয়ে উঠলো। পাঁচদিনের দিন তাতে পুঁজ হল। ন-দশদিনের মাথায় শুকিয়ে গেল। কেবল ফোসকা ঘায়ের ক্ষতচিহ্ন রয়ে গেল।

জেম্‌স্‌কে কাছে ডেকে ডাক্তার জেনার বললেন, 'জেম্‌স্, তোমায় একটা কথা বলবো।'

—'বলুন।' জেম্‌স্ মাথা নীচু করে বলে।

—'যদি কোন লোকের বসন্ত হয়, তার গা থেকে বসন্তের বিষ তোমার গায়ে ঢুকিয়ে দেব। তুমি রাজী আছ?'

বালক জেম্‌স্ একটুও ভয় পেল না। বুক ফুলিয়ে বলল, 'আমি রাজী।'

—'যদি মারা যাও?'

—'মরতে তো একদিন হবেই।' জেম্‌স্ ডাক্তারের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বলে, 'আর আপনি যদি বাঁচাতে না পারেন, তাহলে কেউই পারবে না।'

ডাক্তার মুগ্ধ হয়ে বসে থাকেন। পৃথিবীর জন্য বালকের ত্যাগ দেখেন। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় ছুটে বালককে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'তোকে আমি মরতে দেব না জেম্‌স্। তোকে অমর করে রাখবো।'

দিন যায়। ডাক্তার অপেক্ষায় থাকেন। অবশেষে একদিন এক বসন্ত রোগীর দেখা পেলেন। বসন্তের দগদগে ঘা, সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। চোখের মধ্যে বসন্তের গুটি বেরিয়ে দৃষ্টি নষ্ট করে দিয়েছে। ডাক্তার জেনার রোগীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর পাশে কিশোর বালক জেম্‌স্।

—'জেম্‌স্!' গম্ভীর ভরাট গলায় ডাক্তার বললেন, 'তোমার পরীক্ষার সময় এসেছে।'

জেম্‌স্ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তার তাঁর ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে রোগীর ঘায়ের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে খানিকটা পুঁজ টেনে নিয়ে এলেন। তারপর সেই পুঁজ সুদ্ধ ছুরির ফলাকা জেম্‌সের হাতে ঢুকিয়ে দিলেন। বসন্তের জীবাণু জেম্‌সের দেহে ঢুকে গেল।

তারপর রোগীকে যথাযথ ওষুধ দিয়ে জেম্‌স্‌কে নিয়ে বাড়ি চলে এলেন। কয়েকদিন পরে খবর পেলেন রোগীটি বসন্তে মারা গেছে। ডাক্তার ঘরের মধ্যে অস্থির পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর আপন মনে কি লিখে যাচ্ছেন। জেম্‌স্ তাঁর পাশে বিছানার উপর বসে। তাকে তিনি ঘর থেকে বেরোতে দেন না। তিনিও কোথাও যান না। রোগী দেখাও ছেড়ে দিলেন একদম।

দিনের পর দিন কেটে যায়। মাস চলে গেল। ডাক্তার জেনার তাঁর পরীক্ষার কথা লিখে যাচ্ছেন। পাশে জেম্‌স্ রয়েছে। তিনি লিখে যাচ্ছেন, গো-বসন্তের জীবাণু তিনি জেম্‌সের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর মানুষের শরীরের বসন্ত জীবাণু তার দেহে দিয়ে দেখেছেন, তার কোন রোগ হয় নি। সে বসন্ত রোগ থেকে মুক্ত রয়েছে। গো-বসন্ত থেকে ওষুধ তৈরি করে যদি মানুষের শরীরে দেওয়া যায়, তাহলে মানুষ বসন্তের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

দু বছর ধরে ডাক্তার বই লিখলেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সেই বই প্রকাশিত হল। দিকে দিকে সাড়া পড়ে গেল। নানা দিকে পরীক্ষা আরম্ভ হল, সবাই দেখল জেনারের গবেষণা ঠিক। সবাই ধন্য ধন্য করে উঠল। লণ্ডনে এক বিরাট সভা ডাকা হল, সেখানে ডাক্তার জেনারকে সংবর্ধনা জানানো হবে। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসে জমা হলেন ডাক্তারের বাড়িতে। ডাক্তার বললেন, 'আমি সভায় যেতে পারি এক শর্তে।'

—'কি শর্ত?'

—'আমার সঙ্গে জেম্‌স্ যাবে, শারা নিমীস যাবে আর সেই ভদ্রমহিলা যাবেন, যিনি প্রথম আমায় ঐ বিষয়ে আলোক দেন।'

—'নিশ্চয়ই যাবে।' একজন মাতব্বর বললেন, 'আপনি তাহলে কাল ওঁদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। আমরা চলি আয়োজন করতে।' ওঁরা বিদায় নিলেন।

বিকেল বেলায় ডাক্তার জেনার জেম্‌স্‌কে সঙ্গে নিয়ে চললেন সেই ভদ্রমহিলার বাড়িতে। বাড়ির সামনে এসে অবাক্। সে বাড়ির চিহ্নও নেই। সেখানে তৈরী হয়েছে একটা বিরাট অট্টালিকা। বাড়ির গেটের কাছে এসে দরোয়ানকে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আগে যাঁরা এখানে থাকতেন, তাঁরা কোথায় গেছেন জানো?'

দরোয়ান উত্তর দিল, 'না। জানি না।'

কোন কথা না বলে ডাক্তার বাড়ির দিকে ফিরলেন। তাঁর চোখের কোণে জল টলটল করছে। অবাক্ হয়ে জেম্‌স্ মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সে ভেবে পেল না ডাক্তারের চোখে কেন জল?

: অনুশীলনী :

১। বসন্তের প্রতিষেধক আবিষ্কারের কাহিনীটি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখ।

২। ক) 'ভদ্রমহিলার মাথা ভক্তিতে নুয়ে পড়ল'—কেন? এই মহিলা ডাক্তার জেনারের আবিষ্কারে কিরূপ সাহায্য করেছিলেন?

খ) 'শেষ রাতে উঠে বসে থাকতেন কখন তাঁর গোয়ালিনী দুধ দিতে আসবে'—এই গোয়ালিনীর নাম কি? গোয়ালিনীটি কিভাবে ডাক্তার জেনারের নিকট অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল?

গ) 'আমি সভায় যেতে পারি এক শর্তে'—এই শর্তটি কি? শর্তটি আরোপ করার মধ্য দিয়া ডাক্তার জেনারের চরিত্রের কোন্ বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে?

৩। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :—

ক) ঈশ্বরের দূতের……দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

খ) আমি যা করতে……কল্যাণের জন্যই করছি।

গ) তাঁর চোখের……জল টলটল করছে।

৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

ক) মুখে একটা — ভাব।

খ) ডাক্তারবাবু কি — বিচার করছেন আজকাল?

গ) আর আপনি যদি না — পারেন, তাহলে কেউ পারবে না।

ঘ) বসন্তের জীবাণু—দেহে ঢুকে গেল।

ঙ) আর সেই ভদ্রমহিলা যাবেন, যিনি প্রথম আমায় এ বিষয়ে— দেন।

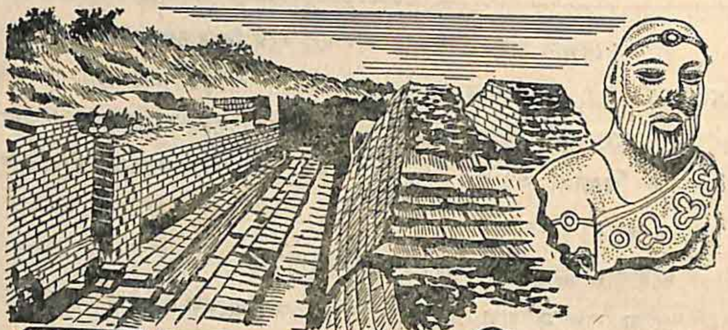
৫। ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর :—

ক) ডাক্তার জেনার তখনকার দিনে সবচেয়ে নামকরা আর নিষ্ঠুর ডাক্তার।

খ) আপনি নিশ্চয়ই দানবের অংশে জন্মেছেন।

গ) এর জন্যে এত কাণ্ড! এ তো গরুদের মধ্যে হরদম হচ্ছে।

জেনারের, বসন্ত রোগের টিকা আবিষ্কারের, চে
কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এই প্রবন্ধে।



মোহেন-জো-দড়োর সমৃদ্ধি

বিমলেন্দু চক্রবর্তী

তাম্রপ্রস্তর যুগের সব সভ্যতাই নদী-মাতৃক। নদীর উৎসধারাই যেন ছিল নগরগুলির প্রাণপ্রবাহ। নীল নদকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল মিশর। টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা। ইয়াংসি কিয়াং ও হোয়াং হো নদীকে ঘিরিয়া চীন সভ্যতা, আর সিন্ধু নদের তীরে মোহেন-জো-দড়ো।

মোহেন-জো-দড়ো এই চারিটির মধ্যে অগ্রগণ্য, শ্রেষ্ঠত্বের বিজয় মুকুট শিরে লইয়া বিদেশীদের প্রলুব্ধ করিত। মোহেন-জো-দড়োকে বলা হয় প্রাচ্য সভ্যতার জন্মভূমি।

মোহেন-জো-দড়ো কৃষি ও শিল্প সমৃদ্ধ নগর। এই নগরের চতুর্দিকে অবারিত শস্যক্ষেত্র। চাষীরা সময়মত জমি চষিয়া তাহাতে বীজ ছড়ায়। যব ও গমের চাষই প্রধান। মোহেন-জো-দড়োর মাটির নীচ হইতে পাওয়া গিয়াছে যব ও গম। এমনি যব ও গম পাওয়া গিয়াছে প্রাচীন মিশরের কবরে। সে যুগে এ দুইটি শস্যই বোধহয় ছিল প্রধান কৃষিশস্য। ইহা ছাড়া তিল, মটর ও রাই প্রভৃতির চাষ হইত বলিয়াও অনুমান করেন অনেকে।

মোহেন-জো-দড়োর রাস্তা উট ও গরুর গাড়ি এবং জনতার কলরবে পূর্ণ। গরুর গাড়িগুলি শস্য বোঝাই। গাড়িগুলির গতি রাজকীয় শস্যভাণ্ডারের দিকে। একটু অগ্রসর হইলেই সেই শস্যভাণ্ডার দেখিতে পাওয়া যাইবে।

শস্যাগার বিরাট। পাকা ইটের গাঁথনিতে মজবুত করিয়া তৈয়ারী। লম্বা এক-শত ফুট এবং চওড়া পঁচাত্তর ফট। ভিতরের জায়গা প্রায় এগার হাজার বর্গফুটের মতো। উপরের দিকে সোজা পঁচিশ ফুট খাড়াই দেওয়াল। তাহার মাথায় ছাদ।

ছাদের নীচে ছোট ছোট গর্ত। এগুলি বোধহয় বায়ু চলাচলের জন্য। বাহিরে চত্বর। চত্বরে গরুর গাড়ি হইতে যব, গম সকল নামাইয়া রাখা হইত। মোহেন-জো-দড়োতে মুদ্রার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। এই সকল শস্য সরকারী কর রূপে দেয়। রাজকর্মচারীরা সব শস্য ওজন করিয়া লইতেন। ওজন, তাহার হিসাব, নাম ধাম সব লিখিয়া রাখা হইত। শস্যাগারের দেওয়ালে শস্য ঢুকাইবার ছিদ্র দিয়া শস্য ঢালিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

গো-শকটগুলি একে একে ফিরিয়া যাইত।

উটের সারি আসিত ইহার পর। তাহাদের পিঠেও শস্য বোঝাই। তখন উট ছিল বাণিজ্যের প্রধান বাহন। দূর দূরান্তের দেশ হইতে উটের পিঠে চাপিয়া মানুষ বহিয়া আনিত পণ্যসামগ্রী। যে সব পথ দিয়া পণ্যবাহী উট চলিত তাহাকে বলা হয় সার্থবাহী পথ।

মোহেন-জো-দড়ো শহর দুইভাগে বিভক্ত। আমরা ইচ্ছা করিলেই যে কোন পথ দিয়া নগরের পশ্চিমপ্রান্তে চলিয়া আসিতে পারি। রাস্তার দুইপাশে অসংখ্য বিপণি। ব্যবসায়ীরা তাহাদের পণ্য লইয়া আজিকার নগরের ব্যবসায়ীর মতই ক্রেতার অপেক্ষায় থাকিত। কোন দোকানে ক্রেতা দেখা গেলে দেখা যাইত আজিকার মতই ব্যবসায়ীরা পাল্লায় বাটখারা দিয়া ওজন করিতেছে পণ্য। ক্রেতা বুঝিয়া লইতেছে তাহার ওজন। পথে হয়তো পড়িবে তামার অস্ত্র তৈয়ারির কারখানা। সেখানে অনেক দক্ষ কারিগর কাজ করিত। ছাঁচে তামা গলাইয়া ঢালিয়া দেওয়া হইত। তৈয়ারী হইত কুঠার, বর্শা, তীর বাটুল ইত্যাদি।

অনেকে ছাঁচে ফেলিয়া সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিত। তৈয়ারী হইত গোঁফ চাঁচার খুর, মেয়েদের মুখ দেখিবার দর্পণ, মাছ ধরিবার বঁড়শি, শস্য কাটিবার কাস্তে, সেলাই করিবার স্ঁচ প্রভৃতি।

অনেকে তামার সহিত টিন মিশাইয়া লইতেন। এগুলি ব্রোঞ্জ। ব্রোঞ্জ দিয়া বর্শা, কুঠার তৈয়ারী হইত। ব্রোঞ্জের তৈয়ারী সুন্দর একটি নর্তকী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

কারখানায় আর এক দল লোক বসিয়া যাইত পাথর লইয়া। তাহারা পাথরে ঘষিয়া ঘষিয়া অস্ত্রপাতির ধার তুলিত।

এই সব তামা আসিত বহু দূর হইতে। সব আলাদা আলাদা করিয়া রক্ষিত হইত। কাহাকেও তামার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে, এই যে তামার তাল দেখিতেছেন, ইহা হইল আফগানিস্থানের। এই দেখুন, আপনার ডান দিকে এগুলি পারস্য হইতে আগত ব্যবসায়ীর কাছ হইতে ক্রয় করা। ঐ পিণ্ডটার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? উহা রাজস্থান হইতে আনা। সেখানকার কারিগররা দল বাঁধিয়া পাহাড় হইতে এগুলি উদ্ধার করিয়াছে।

পাহাড় হইতে তামা উদ্ধার করার কায়দাটি ছিল চমৎকার। আগুনে তাহারা পাথর তাতাইত। পাথর তাতিয়া গেলে জল ঢালিয়া দিত। পাথর যাইত ফাটিয়া।

তাহার পর তোলো গাড়িতে। তোলো উটের পিঠে। চলো মোহেন-জো-দড়ো। উচিত মূল্যে বিক্রয় করিয়া আবার দেশে ফিরিয়া আসিয়া পাথর ফাটাইতে হইবে।

তাহার পর মোহেন-জো-দড়োর কারিগরেরা লাগিয়া গেল তাহাকে পরিশুদ্ধ করিতে। তামা গালাইয়া একে একে ছাঁচে ঢালিয়া দিত। ঢালিয়া দিত তরল উত্তপ্ত তামা। বাহির হইয়া আসিত নানা অস্ত্র আর নানা সামগ্রী।

মোহেন-জো-দড়োতে এইরূপ অসংখ্য কারখানা ছিল। তামার তৈয়ারী দর্পণ পাওয়া গিয়াছে। দর্পণ দেখিতে বিবাহ-আসরে বরের হাতে যে দর্পণ থাকে ঠিক সেইরূপ। পাওয়া গিয়াছে স্ঁচ, বড়শি, মাপকাঠি, বাটখারা, চিরুণি, অঞ্জন শলাকা, শিশুদের ঝুমঝুমি, পাখির খাঁচা প্রভৃতি।

এইসব জিনিসপত্র দূর দূরান্তরে চলিয়া যাইত বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। সার্থবাহ ছিল বাণিজ্যের প্রধান উপায়। প্রতিদিন যেমন অসংখ্য সার্থবাহ মোহেন-জো-

দড়ো প্রবেশ করিত তেমনি বাহির হইয়া যাইত অনেক। নৌকাযোগেও নানা পণ্য আমদানি রপ্তানি চলিত। সুদূর মেসোপটেমিয়াতে, ক্রীট দ্বীপে, ঈষ্টার আইল্যাণ্ডে মোহেন-জো-দড়োর মৃৎ পাত্র ও সীল পাওয়া গিয়াছে।

এই রকম বাণিজ্য-সমৃদ্ধ নগর তখন পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। অত্যন্ত ঘন বসতিপূর্ণ মোহেন-জো-দড়ো ছিল ব্যবসায়ীদের স্বর্গ। দূর দূর হইতে মানুষ আসিত এখানে অর্থলাভের আশায়।

সব মানুষ তাহার দেশকে ভালবাসে। স্বপ্ন দেখে দেশকে বড় করিয়া গড়িয়া তোলার। দেশকে গড়িতে হইলে জানিতে হয় দেশের অতীতকে। মোহেন-জো-দড়ো হইল আমাদের অতীতের সেই গৌরবময় ইতিহাস।

মোহেন-জো-দড়ো পাঁচ হাজার বৎসরের ঘুম হইতে উঠিয়া জানাইয়া দিল ভারতবর্ষ এশিয়ার সভ্যতার মাতৃভূমি।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। মোহেন-জো-দড়োর সমৃদ্ধি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। ক) 'এই নগরের চতুর্দিকে অবারিত শস্যক্ষেত্র'—কোন্ নগরের? সেই শস্যক্ষেত্রে কি কি চাষ হইত? চাষের কি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে?

খ) 'গো-শকটগুলি একে একে ফিরিয়া যাইত'—গো-শকটে করিয়া কি আসিত? সেই দ্রব্যসামগ্রী কোথায় রাখা হইত? কোন্ হিসাবে সেগুলিকে রাখা হইত?

গ) মোহেন-জো-দড়োয় বাণিজ্যের কথা যাহা জান লিখ।

৩। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :—

ক) সব সভ্যতাই নদী-মাতৃক।

খ) মোহেন-জো-দড়ো ছিল ব্যবসায়ীদের স্বর্গ।

গ) মোহেন-জো-দড়ো পাঁচ……এশিয়ার সভ্যতার মাতৃভূমি।

৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

ক) লম্বা একশত ফুট এবং চওড়া — ফুট।

খ) যে সব পথ দিয়া পণ্যবাহী উট চলিত তাহাকে বলা হয় — পথ।

গ) সব মানুষ তাহার — ভালবাসে।

৫। ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর :—

ক) মোহেন-জো-দড়োকে বলা হয় পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্মভূমি।

খ) অনেকে ছাঁচে ফেলিয়া স্থূল যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিত।

গ) দেশকে গড়িতে হইলে জানিতে হয় দেশের বর্তমানকে।

৬। টীকা লিখ :—তাম্রপ্রস্তর যুগ, মোহেন-জো-দড়ো, সার্থবাহী, ব্রোঞ্জ, সীল।

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা-লীলাভূমি মহেঞ্জোদড়ো
সভ্যতা - মানব বিষয় - এই প্রবন্ধে



শিবে অন্নদান

ভারতচন্দ্র রায়

অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন।
অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন ॥
কারণ অমৃত পূরিত করি।
রত্ন-পানপাত্র দিলা ঈশ্বরী ॥
সঘৃত পলান্নে পূরিয়া হাতা।
পরশেন হয়ে হরিষে মাতা ॥
পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত।
পূরেণ উদর সাদের মত ॥
পায়সপয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টকপর্বত কচমচিয়া ॥
চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া।
কচর মচর চর্ব্য চিবিয়া ॥
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক চক পেয় পিয়া ॥
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া ॥
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে ॥
লটপট জটা লপটে পায়।
ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায় ॥

গর গর গর গরজে ফণী।
দপ দপ দপ দীপয়ে মণি॥
ধক ধক ধক ভালে অনল।
তর তর তর চাঁদ মণ্ডল॥
সর সর সরে বাঘের ছাল।
দলমল দোলে মুণ্ডের মাল॥
তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল।
তাতা থেই থেই বলে বেতাল॥
ববম ববম বাজয়ে গাল।
ডিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাল॥
ভভম ভভম বাজায়ে শিঙ্গা।
মৃদঙ্গ বাজয়ে তাধিঙ্গা ধিঙ্গা॥
পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চম তালে।
নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে॥
নাটক দেখিয়া শিব ঠাকুর।
হাসেন অন্নদা মৃদু মধুর॥
অন্ন-অন্ন দেহ এই যাচে।
ভারত ভুলিল ভবের নাচে॥

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। কবিতাটি মুখস্থ লিখ।
২। কবিতাটির সারসংক্ষেপ কর।
৩। ক) শিবের আহারের বিবরণ দাও।
খ) 'নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে'—শিব কিভাবে নাচিলেন তাহার বিবরণ দাও।
৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :—
ক) হরিষে অবশ......মুণ্ডের মাল।
খ) নাটক দেখিয়া......ভবের নাচে।

সঙ্গেতে না যাবে

রামপ্রসাদ সেন



নীতি তোয় বুঝাবে কেটা।
বুঝে বুঝলি নারে মনরে ঠেঁটা ॥
কোথা রবে ঘর বাড়ি তোর কোথা রবে দালান-কোঠা।
যখন আসবে শমন বাঁধবে ক'ষে কোথা রবে খুড়-জ্যাঠা ॥
যত ধন জন সব অকারণ সঙ্গেতে না যাবে কেটা।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে ছাড়রে সংসারের লেঠা ॥

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। কবিতাটি মুখস্থ বল।
২। কবিতাটির সারাংশ লিখ।
৩। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :—যখন আসবে……রবে খুড়-জ্যাঠা।
৪। ঠেঁটা, কোঠা, শমন, কেটা—শব্দের অর্থ কি ?

এটি - একটি - ভক্তিমূলক গান। [illegible]
[illegible]
[illegible]



সৃষ্টিকর্তা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কে সৃজিলা এ সুবিশ্বে, জিজ্ঞাসিব কারে
এ রহস্য কথা, বিশ্বে আমি মন্দমতি ?
পার যদি, তুমি দাসে কহ, বসুমতি ;—
দেহ মহা-দীক্ষা, দেবি, ভিক্ষা, চিনিবারে
তাঁহায়, প্রসাদে যাঁর তুমি, রূপবতি,—
ভ্রম অসম্ভ্রমে শূন্যে ! কহ, হে আমারে,
কে তিনি, দিনেশ রবি, করি এ মিনতি,
যাঁর আদি জ্যোতিঃ, হেম-আলোক সঞ্চারে
তোমার বদন, দেব প্রত্যহ উজ্জ্বলে ?
অধম চিনিতে চাহে সে পরম জনে,
যাঁহার প্রসাদে তুমি নক্ষত্র-মণ্ডলে
কর কেলি নিশাকালে রজত-আসনে,
নিশানাথ। নদকুল, কহ কলকলে,
কিম্বা তুমি, অম্বুপতি, গম্ভীর স্বননে।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। কবিতাটি মুখস্থ লিখ।
২। কবিতাটির সারমর্ম লিখ।
৩। ক) কিভাবে বসুমতি সৃষ্টিকর্তার প্রসাদ-ধন্যা ?
খ) কবি কাহাকে স্রষ্টার পরিচয় দানের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।
৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :—দিনেশ রবি……প্রত্যহ উজ্জ্বলে।



প্রার্থনা

অক্ষয়কুমার বড়াল

দুঃখী বলে,—'বিধি নাই, নাইক বিধাতা
চক্রসম অন্ধ ধরা চলে'।
সুখী বলে, 'কোথা দুঃখ, অদৃষ্ট কোথায় ?
ধরণী নরের পদতলে'।
জ্ঞানী বলে,—'কার্য আছে, কারণ দুর্জ্ঞেয় ;
এ জীবন প্রতীক্ষা-কাতর'।
ভক্ত বলে,—'ধরণীর মহারাসে সদা
ক্রীড়ামত্ত রসিক-শেখর'।
ঋষি বলে,—'ধ্রুব তুমি, বরেণ্য ভূমান্'।
কবি বলে,—'তুমি শোভাময়'।
গৃহী আমি, জীবযুদ্ধে ডাকি হে কাতরে,—
'দয়াময়, হও হে সদয়'!

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। কবিতাটি মুখস্থ লিখ।
২। কবিতাটির সারাংশ নিজ ভাষায় লিপিবদ্ধ কর।
৩। ক) জ্ঞানী কি বলেন ?
খ) গৃহীর বক্তব্য কি ?
৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :—
ক) কোথা দুঃখ……নরের পদতলে।
খ) ধ্রুব তুমি……তুমি শোভাময়।



যেমনি, মা গো, গুরু গুরু
মেঘের পেলে সাড়া,
যেমনি এল আষাঢ় মাসে
বৃষ্টিজলের ধারা ;
পুবে হাওয়া মাঠ পেরিয়ে
যেম্‌নি পড়ল আসি
বাঁশ বাগানে সোঁ সোঁ ক'রে
বাজিয়ে দিয়ে বাঁশি,
অমনি দেখ মা, চেয়ে—
সকল মাটি ছেয়ে
কোথা থেকে উঠল যে ফুল
এত রাশি রাশি ॥
তুই যে ভাবিস ওরা কেবল
অম্‌নি যেন ফুল,
আমার মনে হয় মা, তোদের
সেটা ভারি ভুল।

ওরা সব ইস্কুলের ছেলে,
পুঁথি পত্র কাঁখে—
মাটির নীচে ওরা ওদের
পাঠশালাতে থাকে।
ওরা পড়া করে
দুয়োর-বন্ধ ঘরে,
খেলতে চাইলে গুরুমশায়
দাঁড় করিয়ে রাখে॥

বোশেখ জষ্ঠি মাসকে ওরা
দুপুর বেলা কয়,
আষাঢ় হলে আঁধার ক'রে
বিকেল ওদের হয়।
ডালপালারা শব্দ করে
ঘন বনের মাঝে,
মেঘের ডাকে তখন ওদের
সাড়ে চারটে বাজে।

অম্‌নি ছুটি পেয়ে
আসে সবাই ধেয়ে,
হলদে রাঙা সবুজ সাদা
কত রকম সাজে॥

জানিস, মা গো? ওদের যেন
আকাশেতেই বাড়ি,
রাত্রে যেথায় তারাগুলি
দাঁড়ায় সারি সারি।

দেখিস নে মা ? বাগান ছেয়ে
ব্যস্ত ওরা কত !
বুঝতে পারিস কেন ওদের
তাড়াতাড়ি অত ?
জানিস কি কার কাছে
হাত বাড়িয়ে আছে
মা কি ওদের নেইকো ভাবিস
আমার মায়ের মতো ॥

: অনুশীলনী :

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। কবিতাটির সারাংশ লিখ।

৩। ক) 'অমনি দেখ্ মা চেয়ে'—কখন মা চাহিয়া দেখিবেন ? কি দেখিবেন ?

খ) 'গুরুমশায় দাঁড় করিয়ে রাখে'—কাহাদের ? কখন ? তাহারা কোথায় থাকে ?

গ) 'ওদের সাড়ে চারটে বাজে'—কাহাদের ? কখন সাড়ে চারটে বাজে ? তাহারা তখন কি করে ?

ঘ) 'ব্যস্ত ওরা কত'—কাহারা ব্যস্ত ? কখন ? ব্যস্ততা কি জন্য।

৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :—

ক) পুবে হাওয়া……এত রাশি রাশি।

খ) ওরা সব ইস্কুলের……পাঠশালাতে থাকে।

গ) মেঘের ডাকে তখন……কত রকম সাজে।

ঘ) জানিস কি কার……আমার মায়ের মতো ?



প্রাণান্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত।
জন্মিতে কে চাইত যদি
আগে সেটা জান্‌ত।
ভোরে উঠেই ঘুমটি নষ্ট,
তার পরেতে যে সব নষ্ট,
বর্ণিতে অক্ষম আমি সে সব বৃত্তান্ত।
স্নানাদির পর নিত্য নিত্য
ক্ষুধায় জ্ব'লে যায় যে পিত্ত ;
খেতে বসলে চর্বণ কর্তে কর্তে পরিশ্রান্ত ;
যদিই বা খাই যথাসাধ্য,
খেলেই যায় ফুরায়ে খাদ্য ;—
পান্ত আনতে লবণ ফুরায়
লবণ আনতে পান্ত।
দিনে গা গড়াবামাত্র,
বসে মাছি সর্ব গাত্র ;—
রাত্রে মশার ব্যবহার অভদ্র নিতান্ত।
কিনিলেই কোনও দ্রব্য,
দাম চাহে যত অসভ্য ;
রাস্তা জুড়ে বসে আছে পাওনাদার দুর্দান্ত।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর ?
২। কবিতাটির সারসংক্ষেপ লিখ।
৩। ক) 'বর্ণিতে অক্ষম আমি সে সব বৃত্তান্ত'—কোন্ প্রসঙ্গে কবি একথা বলিয়াছেন ?
খ) 'অভদ্র নিতান্ত'—কাহাদের কথা বলা হইয়াছে ?
৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ ঃ—
প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত।



নমো নমো নমো জননি বঙ্গ ;

উত্তরে ঐ অভ্রভেদী,
অতুল, বিপুল, গিরি অলঙ্ঘ্য,
দক্ষিণে সুবিশাল জলধি,
চুম্বে চরণ-তল নিরবধি,
মধ্যে পূত-জাহ্নবী-জল—
ধৌত শ্যাম ক্ষেত্র সঙ্ঘ।

বনে বনে ছুটে ফুল-পরিমল,
প্রতি সরোবরে লক্ষ কমল,
অমৃতবারি সিঞ্চে, কোটি
তটিনী, মত্ত, খর-তরঙ্গ,

কোটি কুঞ্জে মধুপ গুঞ্জে,
নব কিশলয় পুঞ্জে পুঞ্জে,
ফল-ভর-নত শাখি বৃন্দে
নিত্য শোভিত অমল বঙ্গ।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। কবিতাটি মুখস্থ লিখ। ২। কবিতাটির সারসংক্ষেপ কর।
৩। ক) বঙ্গভূমির উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যে কি ?
খ) 'নিত্যশোভিত অমলবঙ্গ'—বঙ্গভূমির শোভার বর্ণনা দাও।
৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ ঃ—
ক) নমো নমো নমো……ক্ষেত্র সঙ্ঘ। খ) বনে বনে ছুটে……অমল বঙ্গ।
৫। জলধি সিঞ্চে, মধুপ, ভর, শাখি—অর্থ লিখ।

৫—সপ্তস্বরা



ছেলেবেলা একদিন প্রতিমা-ভাসান
একেলা দেখিতে যাই, ঘর ছেড়ে দূরে।
পথ ভুলে রাত্রিবেলা মরি ঘুরে ঘুরে,
ভয়েতে বিহ্বল দেখি সুমুখে শ্মশান!

অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে হই পরিশান,
কাঁপে বুক, ঝরে আঁখি, বাক্য নাহি স্ফুরে!
সহসা মশাল হাতে, ভিখারির সুরে,
পথিক আসিল হাঁকি 'মুশকিল—আসান'!
তস্‌বির মালা হাতে, গায়ে আলখাল্লা,
মুখেতে মুখস্থ বুলি 'লা-আল্লা-ইলাল্লা'!

আজিও নিরাশা বুকে চাপালে পাষাণ,
কানেতে না পশে মোর দুনিয়ার হাল্লা!
হৃদয়-ফকির জপে 'লা-আল্লা-ইলাল্লা',
আকাশেতে শুনি বাণী 'মুশকিল-আসান'!

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। কবিতাটি মুখস্থ বল।
২। কবিতাটির সারমর্ম নিজ ভাষায় লিখ।
৩। ক) ছেলেবেলায় প্রতিমা ভাসান দেখিতে গিয়া কবির কি হইয়াছিল?
খ) 'পথিক আসিল হাঁকি'—কি হাঁকিল? এই পথিক কে? কি করিয়াছিল সে?
৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ:—আজিও নিরাশা বুকে……'মুশকিল আসান'!

ছেলে বেলায় প্রতিমা ভাসান দেখতে গিয়ে কবি



কত কাল রবে নিজ যশ-বিভব-অন্বেষণে ?
দু-দিনের ধনের লাগি ভুলিলে পরম ধনে !

ঘরেতে ধন কর পুঁজি, সঙ্গে নেবে ভাব বুঝি ?
দীনের দুঃখ করো হে মোচন, দীনের অভাব নাই এ দেশে !
দীনের ধনেই ধনী তোমরা—দীনবন্ধু হবেন সুখী।
দীনের দুঃখ করো হে মোচন, পুণ্য হবে ধন অরজনে।

দুটি ঘরে জ্ঞানের আলো, কোটি ঘরে আঁধার কালো ;
এ আঁধার ঘুচাতে হবে—নইলে এ দেশ এমনি রবে।
দানেই এ জ্ঞান দ্বিগুণ হবে—এরাও তোমার মায়ের ছেলে।
এ আঁধার ঘুচাতে হবে যতনে, অতি যতনে।

পুরানো সে ত্যাগের কথা হৃদয়ে কি দেয় না ব্যথা ?
সেই দেশের মানুষ তোমরা—
যেথা রাজার ছেলে হত ফকির, যেথা পরের তরে ঝরত আঁখি ;
যেথা ধন হতে প্রেম ছিল বড়ো, যেথা ধনী ছিল দীনের অধীন।
সেই দেশের মানুষ তোমরা—সে কথা কি আছে মনে ?
কেন এলে তবে মানবের ভবে রবে যদি নিজ কাজে ?
সবাকার মান হোক তব মান, অপমান পর লাজে।—

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। কবিতাটি মুখস্থ লিখ।
২। কবিতাটির সারমর্ম লিখ।
৩। ক) 'নইলে এদেশ এমনি রবে'—কি কারণে কবি একথা বলিতেছেন ?
খ) 'কেন এলে তবে মানবের ভবে'—কবি কি হেতু এ প্রশ্ন করিয়াছেন ?
৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :—
ক) দু-দিনের ধনের……ভুলিলে পরম ধনে।
খ) কেন এলে……পর লাজে।



আকাশের শেষে অবনীর শেষ ;
মেঘের ওপারে শ্রান্ত দিনেশ,
এলাইয়া পড়ে সন্ধ্যার কেশ দখিনায় দুলে' দুলে'।
শোভায় শোভায় আভায় আভায়
ঢেউ-এর উপর ঢেউ খেলে যায়,
হিঙ্গুল বরণ ঢাকিছে সোনায় দূর পাহাড়ের কূলে।
মেঘের প্রান্তে জ্বলিতেছে হীরে,
জ্যোতির ভিতরে জ্যোতি-পড়ে চিরে,
কি ফুল ফুটেছে শিখার শরীরে মেঘের রন্ধ্র পথে !

রকতে রজতে কনকে কাজলে,
মিশেছে উদারে মধুরে উজলে,
ভাসে শত জবা যমুনার জলে, ছোটে তুরন্ত স্রোতে।
নিবিল সহসা কাঞ্চনী শিখা,
কে গেল ছিটায়ে মসীর কণিকা—
নবীন নিবিড় নীল যবনিকা—আধেক ঢাকিল সবি।
শূন্য নয়ন পূর্ণ ভরিয়া
আমি সে মদিরা লইনু হরিয়া—
পাগল পরাণ পাগল করিয়া ডুবিল সন্ধ্যারবি।

: অনুশীলনী :

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।
২। কবিতাটির সারসংক্ষেপ লিখ।
৩। ক) 'দূর পাহাড়ের কূলে' কি হইতেছে?
খ) 'আধেক ঢাকিল সবি' বলিতে কি বোঝান হইয়াছে?
৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :—
ক) জ্যোতির ভিতরে······মেঘের রন্ধ্র পথে।
খ) পাগল পরাণ······ডুবিল সন্ধ্যারবি।

দিনান্তে দিনমণির অস্তগমন সময়ের মে
প্রকৃতি যে অনির্বচনীয় সৌন্দর্য সৃষ্টি করে সে
সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে এই কবিতায়।



আয়রে বাঙ্গালী আয় সেজে আয়,
আয় লেগে যাই দেশের কাজে।
দেখাই জগতে ভেতো বাঙ্গালী
দাঁড়াইতে জানে বীর সমাজে ॥
বহুদিন পরে ডাক এসেছে আজ,
ওরে বাঙ্গালী সাজ তোরা সাজ।
এখনো নীরবে নাই কিরে লাজ!
ধিক রে তোদের ক্ষাত্র তেজে ॥
কোটি কণ্ঠে আজ জয় মা বলিয়া,
দ্বেষ হিংসা আদি চরণে দলিয়া,
দাঁড়াবে বাঙ্গালী আপনা ভুলিয়া
সাজাই বাংলা নূতন সাজে ॥
মাভৈঃ ওঠরে ও বাঙ্গালী বীর,
কতকাল রবি নত করি শির—
শুনেছি রে জয় বাঙ্গালী জাতির,
অনাহত শব্দ ভেরীর মাঝে।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। কবিতাটি মুখস্থ লিখ।
২। নিজের ভাষায় কবিতাটির সারাংশ লিখ।
৩। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ ঃ—বহুদিন পরে……তোদের ক্ষাত্র তেজে।

গ্রামের পথে



—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমার গ্রামের পথে আমার ঘুরে বেড়ায় মন,
যেমন নদীর ঢেউয়ে নাচে প্রভাত-সমীরণ।
পরিচিত পথের গাছে
কি মমতাই মাখা আছে,
ঘাসের ছোট ফুলটি যেন করছে আলাপন।

এমন শ্যামল এমন কোমল লতা কোথায় আর ?
ফুলের ভারে নুয়ে পড়ে শীর্ণ তনু তার।
কি যেন এ পথের ধূলি
করলে নরম সোহাগ গুলি ;
সূর্যকরে পাই যেন তার করের পরশন।

ফিরে যদি জন্মাতে হয়, এই করুণা চাই—
এই গ্রামেতেই দিও দয়াল ফিরে আমার ঠাঁই।
দেবালয়ের এ অঙ্গনে
আসব আবার শুভক্ষণে
তুচ্ছ করি ইন্দ্রপুরী নন্দন-কানন॥

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। কবিতাটি মুখস্থ লিখ।
২। কবিতাটির সারাংশ লিখ।
৩। ক) 'সূর্যকরে পাই যেন'—কবি সূর্যকরে কি পান ? কাহার কাছ হইতে পান ?
খ) 'দেবালয়ের এ অঙ্গনে'—কবি কাহাকে দেবালয় বলিতেছেন ? দেবালয়ের অঙ্গনে কবির কি করিবার বাসনা ?
৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :—ক) ঘাসের ছোট……করছে আলাপন। খ) কি যেন এ……করের পরশন। গ) এই গ্রামেতেই দিও……নন্দন-কানন।



রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা,
হাসির কথা শুনলে বলে,
"হাসব না—না, না—না!"
সদাই মরে ত্রাসে— ঐ বুঝি কেউ হাসে!
এক চোখে তাই মিটমিটিয়ে
তাকায় আশে পাশে।
ঘুম নাই তার চোখে আপনি ব'কে ব'কে
আপনারে কয়, "হাসিস যদি
মারব কিন্তু তোকে!"
যায় না বনের কাছে, কিম্বা গাছে গাছে,
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে!
সোয়াস্তি নেই মনে মেঘের কোণে কোণে
হাসির বাষ্প উঠছে ফেঁপে
কান পেতে তাই শোনে।
ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক জ্বলে আলোর তলে
হাসির ঠারে ঠারে।
হাসতে হাসতে যারা হচ্ছে কেবল সারা
রামগরুড়ের লাগছে ব্যথা
বুঝছে নাকি তারা?

রামগরুড়ের বাসা
ধমক দিয়ে ঠাসা
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়,
নিষেধ সেথায় হাসা।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। কবিতাটির সারসংক্ষেপ লিখ। কবিতাটিতে কবি যদি কোন বিশেষ বক্তব্য প্রকাশ করিতে চাহিয়া থাকেন তবে তাহা নিজ ভাষায় প্রকাশ কর।

৩। ক) 'সদাই মরে ত্রাসে'—কে কিসের জন্ম ত্রাসে মরে ?
খ) 'বুঝছে নাকি তারা'—কাহারা কি বুঝিবে ?

৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :—
ক) যায় না বনের……ফেলে পাছে। খ) রামগরুড়ের বাসা……সেথায় হাসা।

[illegible]



ছড়া

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

থুথুর থুথুর
থুথুর থুড়ি,
শাক-ওয়ালী
তিনকেলে বুড়ী।
কম্‌লা দীঘির
জংলা পাড়
হুমড়ে টানছে
কলমির ঝাড়।

শুশুনি কলমি
ন' ন' করে
বুড়ীর মাথায়
ঝুড়ির পরে।
ঝুড়ির নীচেয়
কাঁপছে ঘাড়—
শীতের হাওয়ায়
কচুর ঝাড়।

পদ্মের পত্রে ছল ছল জল
দলমল দলমল কলমির দল।
চলেছে তিনকাল পা পা হাঁটি
বোঝার উপরি শাকের আঁটি।

কাঁপছে কণ্ঠ উঠছে ডাক—
নাও মা শুশুনি কলমির শাক।
শুশুনি কলমি ন' ন' করে
নামিয়ে নাও মা ঘরে ঘরে।

হাঁকছে তিনকাল শুনছে কে?
কানছে এককাল মুখ ঢেকে।
চলছে চলছে গুটি গুটি—
নাও মা নাও মা দাও মা ছুটি।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। কবিতাটি মুখস্থ বল।
২। কবিতাটিতে কবির বক্তব্য বিষয় নিজের ভাষায় লিখ।
৩। ক) 'হুমড়ে টানছে'—কে কোথায় কি টানিতেছে?
খ) 'বোঝার উপরি শাকের আঁটি'—ইহার অর্থ কি? এখানে পঙ্‌ক্তিটি কি প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হইয়াছে?
৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ—
ক) পদ্মের পত্রে……কলমির দল।
খ) হাঁকছে তিনকাল……দাও মা ছুটি।



চন্দ্র সূর্য বন্দনা

পরশুরাম

চাঁদের জয় হোক,
পরোপকারী ভদ্রলোক,
আস্ত খেঁদো ফালি সব অবস্থাতে
যথাসাধ্য লণ্ঠনের কাজ করে রাতে॥

সূয্যিকে নমস্কার,
এই দেবতাটি মহা ফাঁকিদার,
চোপর রাত দেখা নেই মোটে,
দিনের বেলা রূপ দেখাতে ওঠে,
যখন তার কিছু দরকার নেই—
আরে, আলো তো ভরদিন থাকেই॥

তবে লোকে সূয্যিকে কেন চায়?
কবিরা বলেন বটে—জ্যোৎস্নায়
ফুল ফোটে, মলয় বয়, হেন হয় তেন হয়,
কিন্তু কচি ছেলের কাঁথা কি চন্দ্রালোকে শুখয়?
আমসত্ব, ঘুঁটে আর কাঁচা চম্ম,
এ সব শুখোনো কি চাঁদের কম্ম?

আজ্ঞে না। আমার জানা আছে যদ্দূর,
এর জন্য চাই কাঠফাটা রোদ্দুর।
সূর্য সৃষ্টির কারণই মশাই এই;
বিধাতার রাজ্যে অনর্থক কিছু নেই॥
অতএব গাও চাঁদের জয়, সূয্যির জয়,
দুটোর একটাও ফেলবার নয়।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর—
   ক) — রাত দেখা নেই মোটে।
   খ) আমসত্ব, — আর কাঁচা চন্দ্র।
   গ) — একটাও ফেলবার নয়।
২। কবিতাটিতে কবি কি বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।
৩। ক) 'এই দেবতাটি মহা ফাঁকিদার'—কোন্ দেবতা? কেন তিনি ফাঁকিদার?
   খ) 'গাও চাঁদের জয়, সূয্যির জয়'—কবি কেন চাঁদ ও সূয্যির জয় গাহিয়াছেন?
৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ—
   ক) যথাসাধ্য……করে রাতে।
   খ) বিধাতার রাজ্যে……কিছু নেই।

গাহি তাহাদেরি গান



—কাজী নজরুল ইসলাম

গাহি তাহাদেরি গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।

—সেদিন নিশীথ-বেলা
দুস্তর পারাবারে যে যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা,
প্রভাতে সে আর ফিরিল না কূলে, সেই দুরন্ত লাগি'
আঁখি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশীথে জাগি'
আজো বিনিদ্র গাহি গান আমি চেয়ে তারি পথ-পানে।
ফিরিল না প্রাতে যে-জন সে রাতে উড়িল আকাশ-যানে
নব জগতের শর-সন্ধানী অসীমের পথচারী,
যার ভয়ে জাগে সদা সতর্ক মৃত্যু দুয়ারে দ্বারী।

সাগর গর্ভে, নিঃসীম নভে, দিগদিগন্ত জুড়ে
জীবনোদ্বেগে তাড়া ক'রে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে,
মানিক আহরি' আনে যারা খুঁড়ি' পাতাল যক্ষপুরী
নাগিনীর বিষজ্বালা সয়ে করে ফণা হ'তে মণি চুরি।
হানিয়া বজ্র-পাণির বজ্র-উদ্ধত শিরে ধরি'
যাহারা চপলা মেঘ-কন্যারে করিয়াছে কিঙ্করী।
পবন যাদের ব্যজনী দুলায় হইয়া আজ্ঞাবাহী,—
এসেছি তাদের জানাতে প্রণাম তাহাদের গান গাহি।

: অনুশীলনী :

১। কবিতাটি মুখস্থ লিখ।
২। কবিতাটির সারমর্ম নিজ ভাষায় লিপিবদ্ধ কর।
৩। ক) 'আঁখি মুছি আর রচি গান আমি'—কবি কাহাদের জন্য আঁখি মুছেন এবং গান রচনা করেন?
খ) কবি 'পবন যাদের ব্যজনী দুলায়' বলিয়া কাহাদের বুঝাইতে চাহিয়াছেন? কি ভাবে কবি তাহাদের শ্রদ্ধা জানাইতেছেন?
৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :—
ক) নব জগতের শর-সন্ধানী……মৃত্যু দুয়ারে দ্বারী।,
খ) জীবনোদ্বেগে তাড়া……নিতি যারা মৃত্যুরে।

[illegible]



স্বপ্নের সাধ কবে আর ঝরে!

জীবনানন্দ দাশ

সেই দিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি—
এই নদী নক্ষত্রের তলে
সেদিনো দেখিবে স্বপ্ন—
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!
আমি চ'লে যাব ব'লে
চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে?
লক্ষীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষীটির তরে?
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!

চারিদিকে শান্ত বাতি—ভিজে গন্ধ—মৃদু কলরব;
খেয়ানৌকাগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে;
পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে র'বে চিরকাল;—
এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে।

: অনুশীলনী :

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।
২। কবিতাটিতে কবির বক্তব্য বিষয় নিজ ভাষায় লিপিবদ্ধ কর।
৩। ক) 'আমি চ'লে যাব বলে'—কবি চলিয়া গেলেও পৃথিবীতে কি অপরিবর্তিত থাকিবে? খ) 'এশিরিয়া', 'বেবিলন' সম্পর্কে যাহা জান লিখ।
৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ:—
ক) সোনার স্বপ্নের……কবে আর ঝরে।
খ) পৃথিবীর এইসব……ছাই হয়ে আছে।

আদর কর বাঁদরকে

অন্নদাশঙ্কর রায়



আদর কর বাঁদরকে
বাঁদর যদি কামড়ায় তো
করবে তোমায় আদর কে।
আদর করবে দাদা।
দাদার সঙ্গে আড়ি তোমার—
কাঁচকলা আর আদা।
আদর করবে দিদি।
দিদির দিকে তাকাও না তো—
দিদি কেমন নিধি।
আদর করবে মা।
মায়ের কথা কোনো দিন যে
একটি শুনবে না।
আদর করবে বাবা।
বাবাকে তো করতে আদর
উচিত ছিল ভাবা।
তাই তো বলি, খুকু,
সবার সঙ্গে ভাব কর গো
নইলে পাবে দুখু।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। কবিতাটি মুখস্থ লিখ।
২। কবি কবিতাটিতে কি বলিতে চাহিয়াছেন?
৩। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ ঃ—তাই তো বলি……পাবে দুখু।
৪। শুদ্ধ করিয়া লিখ ঃ—
আড়ি তোমার দাদার সঙ্গে
কাঁচকলা আর আদা।



সাধু

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সাদা মেঘগুলো ভেসে চলে যায়
কোনো তাড়া কোনো কাজ নেই!
জল নেই আর জ্বালাও নেইকো
বুকে তার আর বাজ নেই।
সাদা মেঘগুলো ভেসে চলে যায়
কোনো রং কোনো সাজ নেই।

পাহাড়ের গায়ে মঠের চূড়োটা ছাড়িয়ে,
মেঘগুলো যায় নীল দিগন্তে হারিয়ে।
মঠ থেকে বাজে ঘণ্টা
মনটা কেমন করে,
মঠের মাঝের বুড়ো সাধুটিরে
থেকে থেকে মনে পড়ে।

মেঘের মতন সাদা চুল তার,
গোঁফ দাড়ি ধবধবে,
মুখে লেগে আছে প্রাণের হাসির
ফেনাই বুঝি বা হবে।

পাথুরে সিঁড়ির ধারে বসে থাকে
মনে হয় কোনো কাজ নেই।
প্রীতির জ্বারকে জরে' জরে' যেন
মনে আর কোনো ঝাঁজ নেই।
ঢিলে কোঁচকান মুখখানি তার,
মনে শুধু কোনো ভাঁজ নেই।

কেউ যদি তারে শুধায় কখনো,
এ হাসি কোথায় পেলে ?
সাধু হেসে বলে,—পেয়েছি, হৃদয়
আঁখি জলে ধুয়ে ফেলে।

যে-মেঘ ঝড়ের তাড়া খেয়ে ফিরে।
কালো হ'য়ে নেমে আসে,
নিজেরে উজাড় করে ঢেলে সে-ই
সাদা হাসি হ'য়ে ভাসে।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।
২। কবিতাটির মর্ম-কথা নিজ ভাষায় লিখ।
৩। ক) সাদা মেঘের বৈশিষ্ট্য কি ?
খ) সাধুর বিশেষত্ব কি ?
৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ।
ক) প্রীতির জারকে……কোনো ভাঁজ নেই।
খ) যে মেঘ ঝড়ের……হাসি হ'য়ে ভাসে।

বারো মাসের ছড়া

বুদ্ধদেব বসু

সবচেয়ে ভালোবাসি বৈশাখ মাস,
মূর্ত আশার মতো দীপ্ত আকাশ।
জ্যৈষ্ঠের খরতাপ তীব্র পরশ,
রোদ্দুরে যত রোষ আমে তত রস।
দীর্ঘ দ্বিপ্রহর অবসরে ভরা,
সূর্য অস্ত যেতে করে না-তো ত্বরা।
আষাঢ় আঁধার হ'য়ে আকাশে ছড়ায়,
পাখা-পাওয়া পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়।
দলে-দলে চলে মেঘ, জ্বলে বিদ্যুৎ,
হঠাৎ বজ্র বাজে, বৃষ্টির দূত।
তারপর শ্রাবণের রিমঝিম রাত,
জুঁইফুলে গন্ধের স্বপ্নপ্রপাত।
চুপ ক'রে শুয়ে শুয়ে কী-যে ভালো লাগা,
জেগে জেগে ঘুম আর ঘুমে যেন জাগা।
ভাদ্রের মুখে হাসি, চোখে তবু জল,
ঝরায় বাদল তার শেষ সম্বল।
আকাশে একটু লাগে নীলের পালিশ,
ঝিকমিক রোদ ঠিক টাটকা ইলিশ।
রৌদ্রের রূপো হ'লো সোনা একদিন,
পূজোর গন্ধ নিয়ে এলো আশ্বিন।

গাল-ফোলা সাদা মেঘ আহ্লাদে খেলে,
সূর্যের একপাল উজ্জ্বল ছেলে।
কার্তিক ক্লান্তির কুয়াশায় মিশে,
অঘ্রাণে ডেকে আনে ধান্যের শিষে।
ছোটো হ'য়ে আসে দিন, বেলা পড়ে ঢ'লে,
পৌষের সুন্দর রৌদ্রের কোলে।
পাঁচটা না-বাজতেই সূর্য পলায়,
লম্বা ঘুমের রাত লেপের তলায়।
কালো কেলো কই মাছ লাল তেলে ভাসে,
সবুজ মটরশুঁটি সাজে পাশে পাশে।
আজ ভাবি কাল ভাবি শীত বুঝি যায়,
উত্তরে হাওয়া তার উত্তর ছায়।
মর্মরে ঝংকারে মাঘ এলো ঐ,
গাছে-গাছে ডালে-ডালে লাগে হৈ-চৈ।
আজ কেন সব-কিছু লাগছে নতুন?
গুনগুন-গুঞ্জনে এলো ফাল্গুন।
উঁকি দেয় উৎসুক আম্র মুকুল,
তারি ফাঁকে কোকিলের বসে ইসকুল।
বাক্সে লুকোয় যত কম্বল শাল,
হঠাৎ হাওয়ায় লাগে চৈত্রের তাল।
দিল খোলা দক্ষিণ, হালকা শরীর,
কত যেন ফুর্তির দিন রাত্তির।
ইচ্ছার উৎসাহ উচ্ছলে প্রাণে,
কাঁচা আম গ্রীষ্মের আশ্বাস আনে।

ঐরাবতের মতো বৈকালী মেঘে,
উত্তাল ওঠে কাল বৈশাখী রেগে।
ছিঁড়ে যায়, উড়ে যায় পুরোনোর ঝাঁক,
কালবৈশাখী মানে, কাল বৈশাখ।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। কবিতাটি মুখস্থ বল।
২। কবিকে অনুসরণ করিয়া বারমাসের বৈশিষ্ট্য নিজভাষায় লিপিবদ্ধ কর।
৩। ক) রোদ্দুরে যত রোষ আসে তত রস—ইহার অর্থ কি ?
খ) জেগে জেগে ঘুম আর ঘুমে যেন জাগা—বলিতে কবি কোন্ সময়ে কিসের ইঙ্গিত দিয়াছেন ?
গ) সূর্যের একপাল উজ্জ্বল ছেলে—অর্থ কি ?
ঘ) 'কালবৈশাখী মানে, কাল বৈশাখ'—বলিতে কবি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন ?
৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :—
ক) আষাঢ় আঁধার হ'য়ে···চূড়ায় চূড়ায়।
খ) আকাশে একটু লাগে···টাটকা ইলিশ।
গ) আজ কেন সব-কিছু···বসে ইসকুল।

কতোবার এল কতো না দস্যু

কবি বিষ্ণু দে

কতোবার এল কতো না দস্যু!
কতো না বার
ঠগে ঠগে হল আমাদের কতো
গ্রাম উজাড়

কতো বুলবুলি খেল কতো ধান,
কতো মা গাইল বর্গীর গান
তবু বেঁচে থাকে অমর প্রাণ
এ জনতার—
কৃষাণ, কুমোর, জেলে, মাঝি,
তাঁতি আর কামার।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। কবিতাটি মুখস্থ লিখ।
২। কবিতাটির সারাংশ লিখ।
৩। ক) 'ঠগে ঠগে হল আমাদের কতো গ্রাম উজাড়'—অর্থ কি?
খ) বর্গী বলিতে কি বুঝ?
৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ—
কতো বুলবুলি……এ জনতার—
৫। কৃষাণ, কুমোর, জেলে, মাঝি, তাঁতি, কামার—কাহাদের বলে?

[illegible]

আরও ভালো এক ছবি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দেখ দেখ, এই ছোট্ট সবুজ উঠোনেই—
হামাগুড়ি দেয়,
ব্যথা পেলে কাঁদে,
প'ড়ে গেলে ঠেলে ওঠে ফের,
ছোট ছোট দুটো মুঠো দিয়ে বাঁধে
সাধ আহ্লাদ আমাদের।
হাত ছেড়ে দিলে দেয়ালটা ধ'রে
করে হাঁটি-হাঁটি পা-পা।
ভুলে যেন তাকে
দিও নাকো মাটি চাপা।

এখনও আকাশ সূর্যের রঙে
রাঙা নয়।
শিয়রে দাঁড়িয়ে থাবা তুলে আছে
গলিতনখ এ রাত্রি।
তবু যদি দুটি একটি করেও পাপড়ি
খুলে যায়,
কাছে থেকো—
পাছে কোনো মদমত্ত হাতির পায়ে
সেটুকুও হয় থেঁতো।

মন দাও আজ
তাজা রঙে এঁকে
দেশ জুড়ে আরও ভালো এক ছবি
টাঙানোর।
আস্ত একটি জীবনকে ঘরে আনা যাক
—একটুও যার ভাঙা নয়।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।
২। কবিতাটির সারমর্ম নিজ ভাষায় লিখ।
৩। ক) 'সাধ-আহ্লাদ আমাদের' বলিতে কবি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন ?
খ) কবি কিসে মন দিতে বলিয়াছেন ?
৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ—
ক) ভুলে যেন……মাটি চাপা।
খ) আস্ত একটি জীবনকে……একটুও যার ভাঙা নয়।

জীবন যাতে মৃত্যুর বিপরীতের মাধ্যম-
স্তূপ হয়ে না যায়, তাই এই কবিতা সমস্ত
কথা উপস্থাপিত হয়েছে এই কবিতায়।

আমাদের ডাক এসেছে

সুকান্ত ভট্টাচার্য



আমাদের ডাক এসেছে,
এবার পথে চলতে হবে,
ডাক দিয়েছে গগন-রবি
ঘরের কোণে কেই বা রবে।
ডাক এসেছে চলতে হবে আজ সকালে
বিশ্ব পথে সবার সাথে সমান তালে
পথের সাথী আমরা রবির
সাঁঝ-সকালে চলরে সবে ॥

ঘুম থেকে আজ সকালবেলা ওঠ রে
ডাক দিল কে পথের পানে ছোট রে,
পিছন পানে তাকাসনি আজ চল সমুখে
জয়ের বাণী নূতন প্রাতে বল ও' মুখে
তোদের চোখে সোনার আলো
সফল হয়ে ফুটবে কবে ॥

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। কবিতাটি মুখস্থ লিখ।
২। কবিতাটির সারাংশ লিখ।
৩। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ ঃ—
   ক) ডাক এসেছে……সমান তালে।
   খ) পিছন পানে……ফুটবে কবে।

সমাপ্ত

পরিশিষ্টাংশ

লেখক ও কবি-পরিচিতি

এবং

অতিরিক্ত প্রশ্ন

গদ্যাংশ

১। দুই বিলাসীর গল্প

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

লেখক-পরিচিতি ঃ (১৮২০—১৮৯১) ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে আদি নিবাস। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাসাগর উপাধি পান। আসল নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সংস্কৃত কলেজে তিনি অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তৎপরে শিক্ষা বিভাগেও কাজ করেন। বাংলাদেশের শিক্ষা বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে তাঁর কাজ স্মরণীয়। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'কথামালা', 'বোধোদয়', 'বর্ণপরিচয়' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করে তিনি আজও বাঙালী হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি একাধারে ছিলেন দানী ও মাতৃভক্ত।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

১। **মৌখিক প্রশ্নাবলী ঃ**

(১) ধর্মপুরের গোবিন্দ নাম্নী ব্রাহ্মণের পুত্র দুইজনের গুণাগুণ বল।

(২) 'পাচক চতুর্বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিলেন'—এই চতুর্বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য কি কি?

(৩) 'তুমি যথার্থ ভোজনবিলাসী'—এ কথা কে কখন কেন বলেছিলেন?

(৪) 'তুমি যথার্থ শয্যাবিলাসী'—কিভাবে শয্যাবিলাসী তা সপ্রমাণ করেছিলেন?

২। **ব্যাসবাক্যসহ সমাস বল ঃ**

দুর্জ্ঞেয়, দুর্লক্ষ্য, অসাধারণ, বিস্ময়জনক, পরীক্ষার্থে, সাতিশয়, ভূপতিসমীপে, প্রতিগমন, শবগন্ধ, দুগ্ধফেননিভ, যৎপরোনাস্তি।

৩। **শব্দার্থ বল ও বাক্যে ব্যবহার কর :**
গাত্রোত্থান, প্রতিগমন, সন্নিহিত, উন্মত্তপ্রলাপবৎ, দুগ্ধফেননিভ, সাতিশয়, অন্বেষণ, সহোদর, পারিতোষিক।

- একটি মজার গল্প তোমাদের সাহিত্য সভায় বল।

২। ভক্তির জয়

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

লেখক-পরিচিতি : (১৮৪৪—১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ) : বাংলার প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা। কলকাতায় জন্ম। পিতা নীলকমল ঘোষ। গিরিশচন্দ্র প্রফুল্ল, জনা, বলিদান, মীরকাসিম, সিরাজদ্দৌলা, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, অশোক, মায়াতরু প্রভৃতি বহু পুস্তক রচনা করে গেছেন। লোকে তাঁকে বাংলার গ্যারিক বলত। তিনি সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

১। **মৌখিক প্রশ্ন :**

(১) বঙ্কিম নয়ন কি ?

(২) 'বাহাত্তুরে ধরেছে'—বাহাত্তুরে বলতে কি বোঝ ?

(৩) 'আর আমি কন্ধকাটা'—কন্ধকাটা কাকে বলে ?

(৪) 'বৈকুণ্ঠে যেতে'—বৈকুণ্ঠে কে থাকেন ? কেন অনেক মানুষের সেখানে যেতে সাধ হয় ?

(৫) এই নাটিকায় শ্রীমধুসূদনের কয়েকটি নাম ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলি কি কি ?

২। **বিপরীতার্থক শব্দ বল :**
কম, বস, তলায়, নিন্দা, বুদ্ধি, বঙ্কিম, কৃপা, বুড়ো, অসাধ, ভয়ে, বোকা, খুলছি, বিশ্বাস, সোজা, দুঃখ।

৩। নয়ন, বাবা, নদী, দেহ—পদগুলির তিনটি করে সমার্থক শব্দ বল।

৪। বুড়ো, ব্রাহ্মণ, ছোঁড়া—কথাগুলোর বিপরীত লিঙ্গ বল।

৩। জাহাজের খোল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক-পরিচিতি : (১৮৬১—১৯৪১) : ভারতীয় সাহিত্যের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালের ৮ই মে (২৫শে বৈশাখ) কলকাতার তথা বাংলাদেশের তৎকালীন বিশিষ্ট প্রতিভাশালী ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটক-সঙ্গীত

সাহিত্যের সকল শাখাকেই তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর রচিত 'গীতাঞ্জলি'র জন্য ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিখ্যাত নোবেল পুরস্কার পান। প্রৌঢ় বয়সে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী স্থাপন করে তিনি প্রাচীন তপোবনাদর্শে নতুন এক শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি পৃথিবীর প্রায় সব দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা বিপুল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় এই বিশ্ববিখ্যাত মনীষীর জীবনাবসান ঘটে।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

১। মৌখিক প্রশ্নাবলী :

(১) লেখক জ্যোতি দাদার একটি জাহাজের খোল কেনাকে কোন উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেছেন ?

(২) জ্যোতিদাদাকে কেন তিনি বেহিসাবি বলে নির্দেশ করেছেন ?

(৩) 'বরিশাল-খুলনার স্টিমার লাইনে সত্যযুগ আবির্ভাবের উপক্রম হইল'—লেখকের এ কথা বলার উদ্দেশ্য কি ?

(৪) 'অব্যবসায়ী ভাবুক মানুষের'—কুগ্রহ কি ?

(৫) 'তখন তাঁহার ব্যবসায় বন্ধ হইয়া গেল।'—কার কোন ব্যবসা কেন বন্ধ হল ?

২। শব্দার্থ বল ও বাক্যে ব্যবহার কর :

নিলামে, রসনা, অব্যবসায়ী, নিষ্ফল, ক্ষতিবহন, প্রচণ্ড, বিলুপ্ত, উত্তেজনা, অগ্রসর, উপসর্গ, ততোধিক, বঞ্চিত, অন্ত, অতিক্রম।

৩। 'অঙ্ক' কথাটিকে দু রকম অর্থে বাক্যে ব্যবহার কর।

৪। বিপরীতার্থক শব্দ বল :

পুরা, জ্বলে, শূন্য বেহিসাবি, মৃত্যু, ক্ষতি, সম্পূর্ণ, অভাব, কুগ্রহ, জয়।

৫। শিকার ও স্বীকার ; জ্বলে ও জলে—কথাগুলি ভিন্নার্থে বাক্যে ব্যবহার কর।

৪। প্রাচীন ভারতে রসায়ন বিজ্ঞান

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

লেখক-পরিচিতি : (১৮৬১—১৯৪৪) : বাঙালী হৃদয়ে বিজ্ঞান ও ব্যবসাকে জাগরূক করতে যে কয়জন পথিকৃৎ এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার অন্তর্গত রাড়ুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রসায়ন শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। এই শাস্ত্রে গবেষণার জন্য তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. স্এ-সি. উপাধি প্রাপ্ত

হন। প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে, পরে বিজ্ঞান কলেজে তিনি অতি সুনামের সঙ্গে অধ্যাপনা করেন। তিনি ব্যবসাবিমুখী বাঙালীকে ব্যবসায়ে লিপ্ত হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। সুবিখ্যাত বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানীর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রচিত 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

১। মৌখিক প্রশ্নাবলী :

(১) রসায়ন বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য কি ?

(২) ভারতে প্রাচীনকালে কার চেষ্টায় বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আবিষ্কার হয়েছিল ? তাঁর প্রমাণ কি আজও আছে ? কোথায় ?

(৩) কোন কোন গ্রন্থে প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিষয় লেখা আছে ? কখন উহা রচিত হয় ?

(৪) ক্ষার কয় রকম ও কি কি ?

(৫) প্রাচীন কালে ভারতবাসীরা তীক্ষ্ণ ও মৃদু ক্ষার কিভাবে প্রস্তুত করতেন ?

(৬) খনিজ ধাতুর ব্যাপারে প্রাচীন ভারতের রসায়ন বিজ্ঞান কিরূপ উন্নতি-লাভ করেছিল তা প্রমাণ সহ বল।

(৭) যবক্ষার ও সর্জিক ক্ষার কাকে বলে ?

২। শব্দার্থ বল ও বাক্যে ব্যবহার কর :

নিদর্শন, রসায়নাগার, নিভৃত-নির্জন, মৃদু, তীক্ষ্ণ, বিলিতি, উজ্জ্বল, পারদর্শী, আকৃষ্ট, চর্চা, সমাদর, সম্মান।

৩। ভিন্নার্থ বল এবং বাক্য গঠন কর :

উপাদান } লক্ষ্য } বৈজ্ঞানিক }
উপাধান } লক্ষ } বিজ্ঞান }

৪। এক কথায় প্রকাশ কর :

(ক) যিনি বিজ্ঞান জানেন ; (খ) খৃষ্টজন্মের পূর্ব অব্দ ; (গ) খৃষ্ট-জন্মের পরে অব্দ ; (ঘ) ফুটছে এমন ; (ঙ) মাটিকে ভেদ করে যা ওঠে ; (চ) যা সমুদ্রে জন্মায়।

৫। লালু

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক-পরিচিতি : (১৮৭৬-১৯৩৮): ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ইনি 'কাশীনাথ' নামক একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস লিখে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন।

যৌবনে 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস', 'পথের দাবী', 'বিন্দুর ছেলে', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্প লিখে বিদ্বৎ সমাজে বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রৌঢ় বয়সে তাঁর অজস্র পুস্তক রচনা করে ইনি 'কথা সাহিত্যিক' বলে প্রভূত সম্মান লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডি-লিট' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরোলকগমন করেন।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

১। মৌখিক প্রশ্নাবলী ঃ

(১) 'লালু ঘুম ভেঙে উঠে বসলো, বললে—না।'—কার কোন অনুরোধ শুনে লালু এরূপ বলেছিল? শেষ পর্যন্ত কেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে যেতে হল?

(২) 'সবাই বিস্ময়ে স্তব্ধ'—কি কারণে?

(৩) 'তার হাতের খাঁড়া তখন বনবন করে ঘুরছে'—কার, কখন, কেন?

(৪) 'মা যে জগজ্জননী'—কে কার কোন কথার উত্তরে একথা বলেছেন?

(৫) 'লালু নিজেকে আর সামলাতে পারলে না'—কোন সময়?

(৬) মনোহর চাটুজ্জের বাড়ির কালীপুজোয় পাঁঠাবলি উঠে গেল কেন?

২। শব্দার্থ ও বাক্যে ব্যবহার কর ঃ

অনুপস্থিত, অচেতন, কোপে, নিরুপায়, অমান্য, উর্দ্ধোত্থিত, অন্তিম, আবেদন, সম্মিলিত, উন্মাদ, অকস্মাৎ, বিস্ফারিত, কর্কশ কণ্ঠে, দক্ষযজ্ঞ, বজ্রমুষ্টি, জগজ্জননী, শয়তানি, প্রতিজ্ঞা।

৩। বিপরীত শব্দ বল ঃ

অনুপস্থিত, সত্য, অচেতন, ক্রোধ, আড়ালে, ফাঁকা, অসম্ভব, অমান্য, নিরুপায়, অদূরে।

৪। পদান্তর কর ঃ

ক্রোধ, অচেতন, কোপ, অন্তিম, উন্মাদ, বিস্ফারিত, সম্মিলিত।

৬। দেবলোকের কনক দেউল

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক-পরিচিতি ঃ (১৮৯৪-১৯৫০)ঃ মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৃণালিনী দেবীর জ্যেষ্ঠ সন্তান বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৮ খৃঃ ১২ই সেপ্টেম্বর ২৪ পরগনা জেলার কাঁচড়াপাড়ার হালিশহরের কাছে মুরারিপুকুরে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাসস্থান ২৪ পরগনার বনগাঁ মহকুমার বারাকপুর গ্রাম।

বিভূতিভূষণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন। মধ্যে তিনি এক জমিদারের নায়েব ও তহশিলদারের কাজ নিয়ে ভাগলপুর জেলায় ঘুরে বেড়ান। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হয়। তাঁর সাহিত্য জীবন মাত্র ২১ বছরের। তারই মধ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক পুস্তক রচনা করেন। 'পথের পাঁচালী' তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এছাড়া মেঘমল্লার, অপরাজিত, দৃষ্টিপ্রদীপ, আরণ্যক, আদর্শ হিন্দু হোটেল, ইছামতী ইত্যাদি অমূল্য গ্রন্থরাজি তিনি রচনা করেন। তিনি মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার পান। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ঘাটশিলায় তাঁর মৃত্যু হয়।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

১। মৌখিক প্রশ্নাবলী :

(ক) কাকে দেখে লেখক দেবলোকের কনক দেউল বলেছেন ?

(খ) 'যেন পরীর রাজ্য !'—কার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন। এই পরীর রাজ্যের বর্ণনা দাও।

(গ) 'বালখিল্য মুনিদের মতো'—কাকে বলেছেন ? তার রূপ বল।

(ঘ) 'মেঘের রাজ্যে ফুলের বন'—এর বর্ণনা দাও।

(ঙ) 'যেন কোন অন্ধকার নরকে দীর্ঘ শ্মশ্রু প্রেতের দলের মধ্যে এসে পড়েছে ওরা'—কারা ? এই নরক ও প্রেতের দলের কথা বল।

(চ) 'আফ্রিকার কোনো হীরাখনি সে সবের চেয়ে মূল্যবান নয়'—কোন সবের চেয়ে বল।

২। শব্দার্থ বল ও বাক্যে ব্যবহার কর :

অস্তমান, কনক দেউল, বালখিল্য, হস্তীযূথ, পুষ্পিত, অপার্থিব, কূজন, নিস্তব্ধতা, দীর্ঘশ্মশ্রু, অবসাদ, বৃষ্টিমুখর, অপার্থিব, ধ্যানস্তিমিত, আত্মস্থ, বনস্পতি।

৩। বিপরীত বচন বল :

মেঘ, শিখর, পর্বত, কারা, হস্তী, বনানী, অরণ্য।

৭। উত্তর মেরু পথে পিয়ারী

সুধীন্দ্রনাথ রাহা

লেখক-পরিচিতি : লেখকের জন্ম (১৮৯৬ খ্রীঃ) অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত খুলনা জেলায় 'পলঠা' গ্রামে। পিতা যদুনাথ রাহা ও মাতা মৃন্ময়ী দেবী। ছাত্রজীবনে মেধাবী ছাত্র হিসাবে খ্যাত ছিলেন। ইংরাজীতে সাম্মানিক স্নাতক হয়ে তিনি শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। সাহিত্য সাধনা শুরু করেন নাটক রচনার মধ্য দিয়ে। তাঁর বহু বই মঞ্চস্থ হয়। তারপর ইনি শিশু সাহিত্য

রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন দেশের শতাধিক কালজয়ী উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ করে ইনি সুনামের অধিকারী হন। এখনও ইনি শিশু সাহিত্যে নিজেকে নিয়োগ রেখেছেন।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

১। মৌখিক প্রশ্নাবলী :

(ক) 'জ্যাকসন সাগর'—এর রূপ বর্ণনা কর।

(খ) কোন কোন জাহাজ নিয়ে পিয়ারী উত্তর মেরু অভিযানে গিয়েছিলেন ?

(গ) কেন ফর্মিডেবলকে ফেরানো সম্ভব হচ্ছিল না ?

(ঘ) মেরু মণ্ডলের তুষার ঝঞ্ঝা কিরূপ ?

(ঙ) মেরু মণ্ডলের শীত ঋতুর অবস্থা বর্ণনা কর।

(চ) নাকাহুকা কে ? সে কি কারণে পিয়ারীর লোকের কাছে এল ? সে কি দেব বলেছিল ?

(ছ) 'সে একটা কেউকেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্রামে'—কে কোন গ্রামে কেন কেউকেটা রূপে গণ্য হয়েছে ?

(জ) মেরু সমুদ্রের পরিচয় দাও।

২। শব্দার্থ বল ও বাক্যে ব্যবহার কর :

অনুচ্চারিত, মৃত্যুদণ্ড, আস্তরণ, অবিচ্ছিন্ন, সর্পিল খাল, ভাসমান, বাহুল্যমাত্র, বিলকুল, আশঙ্কা, অমূলক, উৎক্ষিপ্ত, জ্বালানী, অসন্তোষ, ফুরসত, উদয়াস্ত, সাদাসিধে, দেবদুর্লভ, মারাত্মক, সন্তর্পণে, তুষার প্রোথিত।

৩। ব্যাসবাক্য সহ সমাস বল :

অনুচ্চারিত, অবিচ্ছিন্ন, ভাসমান, অমূলক, জ্বালানী, উদয়াস্ত, দেবদুর্লভ, তুষার প্রোথিত।

৮। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

লেখক-পরিচিতি : এই কাহিনীর লেখক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ইনি বহু বিদেশী বই-এর বাংলা অনুবাদ করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। কিছুদিন তিনি কলকাতা রেডিও সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বহু গল্প, প্রবন্ধ, ছোটদের উপযোগী রোমাঞ্চকর পুস্তক লিখে ইনি বঙ্গ সাহিত্যে নিজের স্থান করে নিয়েছেন।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

১। মৌখিক প্রশ্নাবলী :

(ক) ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের একশো বছর পর কারা প্রথম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিকল্পনা গড়ে তোলেন ?

(খ) মঙ্গল পাণ্ডে কে? তিনি কি জন্য ভারত ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন?

(গ) কখন কি কারণে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পত্তন হয়?

(ঘ) জাতীয় কংগ্রেসের বিলাসিতা বলতে কি বোঝ? কিভাবে বিপ্লবী দল গঠিত হল?

(ঙ) বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের বিষয় যা জান বল।

(চ) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তন করলেন কে? তাঁর এই অহিংস অসহযোগের কিছু পরিচয় দাও।

(ছ) নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিষয় যা জান বল।

২। বিপরীত শব্দ বল:

অন্ধকার, ঢাকা, পলায়ন, অলস, ধনী, পরাধীনতা, বিরাট, পরাজয়, অসহায়, পূর্ণ, সচেতন, নত, শুরু, সফল।

৩। টীকা লেখ:

রানী লক্ষ্মীবাঈ, নানাসাহেব, আজিমুল্লাহ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, বীর সাভারকার, চিত্তরঞ্জন দাশ—এঁদের সম্বন্ধে অল্প কিছু বল।

৯। মংপুতীর্থে

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

লেখিকা-পরিচিতি: প্রভাবতী দেবী সরস্বতী একজন বিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক। জন্ম ১৩০২ বঙ্গাব্দের ৭ই ফাল্গুন ২৪ পরগনার গোবরডাঙ্গার খাতুড়া গ্রামে। পিতা গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় মৃত্যু। নবদ্বীপ বিদ্বজ্জন সমাজের পক্ষে তাঁকে স্যার আশুতোষ 'সরস্বতী' উপাধি দেন। তাঁর লেখা বহু উপন্যাস আছে।

অভিপ্রিক্ত প্রশ্ন

১। মৌখিক প্রশ্নাবলী:

(ক) কোথা থেকে মংপুকে ছবির মত দেখায়?

(খ) এখানকার নিত্যকার সঙ্গী সবজির নাম কি?

(গ) মংপুতে কবি কিরূপ আরামে থাকতেন?

(ঘ) মংপু কবির কিরূপ প্রিয়স্থান ছিল? কোন কথার মধ্য দিয়ে তাঁর সেই ভাব প্রকাশ পেয়েছে?

২। শূন্যস্থানে নির্দেশমত পদ বসাও :

(ক) — পথ (বিশেষণ)। (খ) উঁচু — (বিশেষ্য)। (গ) — চমৎকার (বিশেষণের বিশেষণ)। (ঘ) অনবরত হর্ন — (ক্রিয়া)। (ঙ) এখানকার দায়িত্ব —উপর (সর্বনাম)। গুরু, আমি এলাম — অনেক পরে। (অব্যয়)।

৩। শব্দার্থ লেখ :

অভীপ্সিত, ভীষণতা, অনবরত, দুর্ভাবনা, দুষ্প্রাপ্য, নিত্যকার, অভিভূত, সসম্ভ্রমে, আস্তৃত, অবগাহন, সশ্রদ্ধায়, পবিত্র, পরিশুদ্ধ।

১০। অরবিন্দ

শঙ্করনাথ রায়

লেখক-পরিচিতি : (১৯১১-১৯৭৩) : শঙ্করনাথ রায় প্রকৃত নাম নয়, এটি তাঁর ছদ্মনাম। তাঁর আসল নাম প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। কৃতী ছাত্র শঙ্করনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন।

শঙ্করনাথের কীর্তি 'ভারতের সাধক' নামক তের খণ্ডে সমাপ্ত বিশালকায় গবেষণা গ্রন্থ রচনায়। ভারতের বহু স্থানে গিয়ে, বহু তথ্য প্রমাণাদি সংগ্রহের পর শঙ্করনাথ ভারতের যোগী, সাধু মহাপুরুষদের জীবন দর্শন, ধর্মীয় তত্ত্ব ও জীবনী রচনা করেন। এই গ্রন্থটির জন্য লেখক ১৯৬৪ খ্রীঃ রবীন্দ্র পুরস্কার পান।

'ভারতের সাধিকা' বলে তাঁর দুই খণ্ডের একটি গ্রন্থও আছে। ইংরেজী ও হিন্দীতেও তিনি দুখানা জীবনী গ্রন্থ লেখেন।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

১। মৌখিক প্রশ্নাবলী :

(ক) আধুনিক ভারতের ধর্মজীবনে বাংলার কোন জেলার অবদান কেন অতুলনীয় ?

(খ) 'তিনি এড়িয়ে চলে গেলেন'—কি এড়ালেন এবং কেমনভাবে ?

(গ) 'ওরকম লোকের যোগসিদ্ধি হবে না তো কি তোমার আমার হবে'—কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে একথা বলা হয়েছে ?

(ঘ) কিভাবে ভবিষ্যৎ দেশনেতা ও লোকগুরুর আত্মপ্রস্তুতি চলেছিল ?

(ঙ) 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন'-এ কিভাবে তিনি মুক্তি মঞ্চের পুরোধা রূপে চিহ্নিত হলেন ?

(চ) রবীন্দ্রনাথ কি বলে শ্রীঅরবিন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন ?

(ছ) চিত্তরঞ্জন এই মহান মানব প্রেমিককে কি বলেছিলেন ?

(জ) 'সেখানেই শুরু হয় তাঁর জীবনের অতি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়'—কোথায়? কেমনভাবে তিনি সেখানে পৌঁছালেন?

২। শব্দার্থ বল :

অসাধারণ, ব্যুৎপত্তি, জনপদ, নগণ্য, অদম্য, ভারতাত্মার, উদাসীন, উন্মোচিত, পুরোভাগে, পুরোধারূপে, আলিঙ্গন, আত্মগোপন, অন্তর্হিত, পথিকৃৎ।

৩। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

জগন্মাতা, বিবেকানন্দ, মানবাত্মা, নমস্কার, যোগাভ্যাস।

১১। বিষে বিষক্ষয়

বিশ্বনাথ রায়

লেখক-পরিচিতি : বর্তমান বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞানের নানা ঘটনা নিয়ে লেখা বহু প্রবন্ধের লেখক বিশ্বনাথ রায়। পেশায় তিনি চিকিৎসক। কিন্তু সাহিত্যিকরূপে বিশ্বনাথ রায়ের পরিচিতি বর্তমান বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে বিদিত। বহু গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারাবাহিক ইতিহাস বিষয়ে তাঁর লেখাগুলি বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আজও তিনি বাংলা সাহিত্যকে সেবা করে চলেছেন।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

১। মৌখিক প্রশ্নাবলী :

(ক) ডাক্তার জেনার কাকে 'দেবতার অংশে জন্মেছেন' বলেছিলেন? কেন বলেছিলেন?

(খ) 'শোরা, এক্ষুণি তোমার বাড়ি যাব'—একথা কে বলেছিলেন? কেন বলেছিলেন?

(গ) 'তোকে অমর করে রাখবো।'—একথা কে বলেছিলেন? কেন এরূপ কথা তিনি বলেছিলেন?

(ঘ) 'তাঁর চোখের কোণে জল টলমল করছে।'—কার চোখের কোণে? কেন জল টলমল করল?

২। শব্দার্থ বল ও বাক্যে ব্যবহার কর :

কাতরধ্বনি, পদক্ষেপ, স্বর্গীয়, চম্পট, অভ্যর্থনা, নীরবে, গাভী, বিহ্বল, সফল, মুগ্ধ, গবেষণা।

৩। লিঙ্গান্তর কর ঃ

ভদ্রলোক, পথচারী, ডাক্তার, রোগী, ছেলে, যুবতী, বৃদ্ধ, দেবতা, রোগগ্রস্ত, গোয়ালিনী, বিহ্বল, নারী, মহীয়সী, কিশোর।

১২। মোহেন-জো-দড়োর সমৃদ্ধি

বিমলেন্দু চক্রবর্ত্তী

লেখক-পরিচিতি ঃ বিমলেন্দু চক্রবর্তী একজন আধুনিক লেখক। তাঁর লেখা বেশ প্রাঞ্জল। আজকাল নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা দেখা যায়।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

১। মৌখিক প্রশ্নাবলী ঃ

(ক) তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতা যে নদীমাতৃক ছিল তার প্রমাণ কি ?

(খ) সে যুগে কোন্ কোন্‌টি প্রধান কৃষি ফসল ছিল? কি করে তা বোঝা যায়?

(গ) মোহেন-জো-দড়োর শস্যাগারের পরিচয় দাও।

(ঘ) 'সার্থবাহী পথ' বলতে কি বোঝ ?

(ঙ) মহেন-জো-দড়ো শহরটি কয়ভাগে বিভক্ত ছিল? কোন ভাগে কি ছিল ?

(চ) মোহেন-জো-দড়োর কারখানায় কোন কোন জিনিস তৈরি হত ?

২। নীচের শব্দগুলোর অন্ত্যঅক্ষর সাহায্যে নতুন পাঁচটি করে শব্দ গঠন কর এবং তাদের অর্থ লেখ ঃ

টাইগ্রীস, নগর, কলরবে, ওজন, গোঁফ।

৩। নীচের অংশটি চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর ঃ

এই সব তামা আসিত বহু দূর হইতে। সব আলাদা আলাদা করিয়া রক্ষিত হইত। কাহাকেও তামার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে, এই যে তামার তাল দেখিতেছেন, ইহা হইল আফগানিস্থানের। এই দেখুন, আপনার ডানদিকে এগুলি পারস্য হইতে আগত ব্যবসায়ীর কাছ হইতে ক্রয় করা। ঐ পিণ্ডটার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? উহা রাজস্থান হইতে আনা। সেখানকার কারিগররা দল বাঁধিয়া পাহাড় হইতে এগুলি উদ্ধার করিয়াছে।

পদ্যাংশ

১। শিবে অন্নদান

ভারতচন্দ্র রায়

কবি-পরিচিতি ঃ ভারতচন্দ্র রায় (জন্ম ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে—মৃত্যু ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে)ঃ বাংলার বিখ্যাত প্রাচীন কবিদিগের অন্যতম। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় সভাকবি ছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'অন্নদা-মঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' শ্রবণে প্রীত হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে 'রায় গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। **ঠিক পরের লাইনটি লেখ ঃ**

(ক) কারণ অমৃত পূরিত করি।
(খ) পায়সপয়োধি সপসপিয়া।
(গ) লিহ লিহ জিহে লেহ লেহিয়া।
(ঘ) ববম ববম বাজায়ে গাল।
(ঙ) অন্ন-অন্ন দেহ এই যাচে।

২। **মিল দাও ঃ**

হাতা, অঙ্গে, ফণী, অনল, গাল, ঠাকুর।
(যেমন ঃ হাতা, মাতা, ভাতা, ছাতা ইত্যাদি।)

৩। **শঙ্কর ও জাহ্নবীর আরও পাঁচটি নাম বল।**

৪। ভাল ও মাল—কথা দুটো যতরকম অর্থে পার বাক্যে ব্যবহার কর।

২। সঙ্গেতে না যাবে

রামপ্রসাদ সেন

কবি-পরিচিতি ঃ রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন (১৭২৩—১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) একজন বিখ্যাত কবি ও কালীসাধক। হালিশহরের পার্শ্বে কুমারহট্ট গ্রামে তিনি

থাকিতেন। পিতার নাম রামরাম। তাঁহার শ্যামাবিষয়ক গান আজও বাংলার ঘরে ঘরে গাওয়া হইয়া থাকে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন। তাঁহার রচিত 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' ও 'কালী কীর্তন' নামক পুস্তকদ্বয় সুপ্রসিদ্ধ।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। রামপ্রসাদের যে-কোন সঙ্গীত জানা থাকলে লেখো।

২। দেবী দুর্গার আরও পাঁচটি নাম বল।

৩। **গদ্যরূপ লেখ :**

তোয়, কেটা, রবে, হোথা।

৩। সৃষ্টিকর্তা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি-পরিচিতি : মাইকেল মধুসূদন দত্ত (জন্ম ২৫শে জানুয়ারি, ১৮২৪—মৃত্যু ২৯শে জুন, ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) বাংলা ভাষায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক কবি। যশোহরে সাগরদাঁড়ী গ্রামে জন্ম। পিতা রাজনারায়ণ, মাতা জাহ্নবী। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তখন হইতেই তাঁহার উপাধি হয় 'মাইকেল'। বাংলা ভাষায় তিনি চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন। অত্যন্ত দুরবস্থায় হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, শর্মিষ্ঠা নাটক, পদ্মাবতী নাটক, The captive Ladie ইত্যাদি বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। **যে সমশব্দটি ভুল তা কেটে দাও :**

(ক) বসুমতি—ধরা, রাধা, ধরিত্রী, অবনী, মেদিনী, দিনানী, বসুধা।

(খ) নক্ষত্র—তারা, তারকা, খদ্যোত, জ্যোতিষ্ক, বর্তিকা।

(গ) রবি—কবি, ছবি, সূর্য, তপন, চন্দ্রিমা, দিবাকর, দিনমণি।

২। নিশানাথ, অম্বুপতি, দিনেশ—কাকে বলা হয়েছে ?

৩। নীচের শব্দগুলিকে বাক্যে ব্যবহার কর ঃ

রজত-আসনে, হেম-আলোক, নক্ষত্র-মণ্ডলে, মহা-দীক্ষা।

৪। প্রার্থনা

অক্ষয়কুমার বড়াল

কবি-পরিচিতি ঃ অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬৫—১৯১৮ খ্রীঃ) একজন বিখ্যাত কবি। জন্মস্থান চোরবাগান, কলিকাতা। আদি নিবাস ফরাসডাঙ্গা। পিতা কালীচরণ বড়াল। তিনি এষা, প্রদীপ, কনকাঞ্জলি, শঙ্খ প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। কি ব'লে লেখ ঃ

(ক) দুঃখী বলে······

(খ) সুখী বলে······

(গ) জ্ঞানী বলে······

(ঘ) ভক্ত বলে······

(ঙ) ঋষি বলে······

২। এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) ধরণী নরের ·····কোথায় ?

(খ) এ জীবন··· · কি ?

(গ) ক্রীড়ামত ·····কে ?

(ঘ) বরেণ্য ভূমান····· তুমি কি ?

৫। বৈজ্ঞানিক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি-পরিচিতি ঃ ('জাহাজের খোল' গদ্যাংশের পরিশিষ্টাংশ দেখ।)

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। শূন্যস্থানে কবিতার কথা বসাও ঃ

(ক) যেমনি, মা গো ——
মেঘের পেলে সাড়া,
যেমনি এল ——
বৃষ্টিজলের —— ;

(খ) তুই যে ভাবিস ——
অমনি যেন ——
আমার মনে হয় না, তোদের
সেটা ভারি ——।

২। মিল দাও ঃ

রাশি, ফুল, ঘরে, পেয়ে, বাড়ি, কাছে।

৩। সারি, সারি সারি ; রাশি, রাশি রাশি—শব্দগুলো বাক্যে ব্যবহার করে অর্থের পার্থক্য বোঝাও।

৬। প্রাণান্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কবি-পরিচিতি ঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম-এ পাস করিয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত গমন করেন এবং বিলাতেই তাঁহার প্রথম কাজ 'দি লিরিক্স্ অব্ দি ইণ্ড' প্রকাশিত হয়। দেশে ফিরিয়া তিনি সরকারী কাজে নিযুক্ত হন। সময়ের পূর্বেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল অল্প বয়সেই কাব্য রচনা শুরু করিয়াছিলেন। আর্যগাথা ১ম ও ২য়, মন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্য। আষাঢ়ে, হাসির গান ইত্যাদি ব্যঙ্গ কবিতা, এক ঘরে, কল্কি অবতার, বিরহ, ত্র্যহস্পর্শ ইত্যাদি রচনা করার পর কবি তারাবাঈ, রাণা প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, সীতা,

ভীষ্ম, পরপারে, বঙ্গনারী, সোরাব রুস্তম, সিংহলবিজয় ইত্যাদি নাটক পরপর রচনা করেন। তৎকালে নাটকগুলি খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। ঠিক পরের লাইনটি লেখ :

(ক) তার পরেতে যে সব নষ্ট
(খ) ক্ষুধায় জ্বলে যায় যে পিত্ত
(গ) বসে মাছি সর্ব গাত্র
(ঘ) দাম চাহে যত অসত্য

২। এক কথায় প্রকাশ কর :

(ক) প্রাণকে অন্ত করে ;
(খ) ক্ষমতায় যা কুলায় না ;
(গ) পরিশ্রমে ক্লান্ত ;
(ঘ) সাধ্যকে অতিক্রম না করে ;
(ঙ) ভদ্রতা শূন্য ;
(চ) সভ্যতার লেশ নেই এমন।

৭। বঙ্গমাতা

রজনীকান্ত সেন

কবি-পরিচিতি : রজনীকান্ত সেন (২৬শে জুলাই, ১৮৬৫—১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯১০ খ্রীঃ) একজন প্রসিদ্ধ কবি। তিনি 'কান্তকবি' নামে লোকসমাজে খ্যাত। পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে তাঁহার জন্ম। তিনি বাণী, কল্যাণী, অভয়া, আনন্দময়ী প্রভৃতি বই লিখিয়া গিয়াছেন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। নমো নমো নমো……কাকে ?
২। তার উত্তরে ঐ…… কি ?
৩। তার দক্ষিণে……কি ?

৪। বনে বনে ছুটে……কি ?

৫। প্রতি সরোবরে……কি ?

৬। **অর্থের পার্থক্য লেখ :**

লক্ষ, লক্ষ্য ; কমল, কোমল ; সঙ্ঘ, সঙ্গ ; শাখি, শাকি।

৮। মুশকিল আসান

প্রমথ চৌধুরী

কবি-পরিচিতি : প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬ খ্রীঃ) একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক। তিনি 'বীরবল' নামে খ্যাত। পাবনা জেলা আদি বাসস্থান। ঐ জেলার হরিপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। তিনি 'সবুজ পত্রে'র সম্পাদক ছিলেন। তিনি কথ্যভাষায় একটি মার্জিত লেখ্যরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 'নানাকথা', 'পদচারণ', 'চারইয়ারী কথা', 'আহুতি' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। **ঠিক পরের লাইনটি লেখ :**

(ক) পথভুলে রাত্রিবেলা মরি ঘুরে ঘুরে

(খ) অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে তুই পরিশান

(গ) তসবির মালা হাতে, গায়ে আলখাল্লা

(ঘ) আজিও নিরাশা বুকে চাপালে পাষাণ

২। **অর্থ লেখ ও বাক্যে ব্যবহার কর :**

বিহ্বল, তসবির, মুশকিল, দুনিয়ার, হাল্লা, মুশকিল-আসান।

৩। রাত্রি, দুনিয়া, আকাশ—এই শব্দগুলির প্রতিশব্দ লেখ।

৯। এ আঁধার ঘুচাতে হবে

অতুলপ্রসাদ সেন

কবি-পরিচিতি : অতুলপ্রসাদ সেন (১২৭৮—১৩৪১ বঙ্গাব্দ) একজন বিখ্যাত গীতিকার। লক্ষ্ণৌ শহরে তাঁহার কর্মজীবন কাটে। তিনি ব্যারিস্টার

ছিলেন। তিনি 'উত্তরা'-নামক পত্রিকার সম্পাদনা করিতেন। কয়েকটি গান তাঁহার লিখিত বিখ্যাত গানের বই।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। ঠিক পরের লাইনটি লেখ ঃ

(ক) ঘরেতে ধন কর পুঁজি, সঙ্গে নেবে ভাব বুঝি?
(খ) দুটি ঘরে জ্ঞানের আলো, কোটি ঘরে আঁধার কালো;
(গ) যেথা ধন হতে প্রেম ছিল বড়ো, যেথা ধনী ছিল দীনের অধীন
(ঘ) কেন এলে তবে মানবের ভবে রবে যদি নিজ কাজে?

২। বিপরীতার্থক শব্দ মিল করে লেখ ঃ

যশ, দুঃখ, ধন, আঁধার, আলো, নিন্দা, সুখ নির্ধন।

৩। দিন—দীন ; পুণ্য—পূর্ণ ; আঁধার—আধার—কথাগুলির অর্থ পার্থক্য দেখিয়ে বাক্যে প্রয়োগ কর।

১০। দিনান্ত মেঘ

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি-পরিচিতি ঃ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭—১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) একজন বিখ্যাত কবি। নদীয়া জেলার শান্তিপুর গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের পরিদর্শকরূপে কাজ করেন। 'প্রসাদী', ঝরা ফুল', শান্তিজল', ধানদূর্বা', 'শতনরী' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'জগত্তারিণী' স্বর্ণপদক লাভ করেন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। ঠিক পরের লাইনটি লেখ ঃ

(ক) শোভায় শোভায় আভায় আভায়
(খ) মেঘের প্রান্তে জ্বলিতেছে হীরে,

(গ) রকতে রজতে কনকে কাজলে

(ঘ) আমি সে মদিরা লইনু হরিয়া

২। প্রতিশব্দগুলি রেখে ভুলগুলি কেটে দাও :

(ক) অবনী—ধরা, সূর্য, পৃথিবী, নরপতি, বসুধা, সর্বংসহা।

(খ) দিনেশ—মেঘ, নক্ষত্র, সূর্য, তপন, দিবাকর।

(গ) পাহাড়—নগ, খেচর, মেঘ, পর্বত, অদ্রি, হিমাচল।

(ঘ) নয়ন—শরীর, আঁখি, লোচন, মানুষ, নর, চোখ।

১১। আয় রে বাঙালী

মুকুন্দ দাস

কবি-পরিচিতি : মুকুন্দ দাস স্বদেশী যুগের একজন বিখ্যাত দেশপ্রেমিক কবি ও গায়ক। তাঁহার গান সে যুগে ভারতবাসীকে বিশেষভাবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার পূর্বনাম যজ্ঞেশ্বর দে। তাঁহার গুরু অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁহার নামকরণ করেন 'মুকুন্দ দাস।' পিতা বরিশালের গুরুদয়াল দে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ৫৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি তাঁহার রচিত 'মাতৃপূজার' জন্য তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। শূন্যস্থানে কবিতার কথা বসাও :

(ক) আয় রে — আয় সেজে আয়,
আয় — যাই দেশের —।
দেখাই — ভেতো —
দাঁড়াইতে জানে বীর — ॥

(খ) — ওঠরে ও বাঙালী বীর,
কতকাল — নত করি —।
শুনেছি রে জয় — জাতির,
— শব্দভেরীর মাঝে ॥

- মুকুন্দ দাসের আর কোন কবিতা তোমার জানা থাকলে সাহিত্য সভায় বল।

১২। গ্রামের পথে

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কবি-পরিচিতি ঃ কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩—১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ) একজন বিখ্যাত কবি। বর্ধমান জেলার অজয় নদী ও কুনুর নদীর সঙ্গমস্থলের গ্রামে তাঁহার জন্ম। 'শতদল', 'উজানী', 'একতারা', 'নূপুর', 'রজনীগন্ধা', 'দ্বারাবতী', 'বনতুলসী' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। **যে কথাটি ঠিক সেটি রেখে অপরটি কেটে দাও ঃ**

(ক) যেমন নদীর ঢেউয়ে নাচে (প্রভাত সূর্য / প্রভাত সমীরণ)

(খ) ঘাসের ছোট ফুলটি যেন করছে (আলাপন / বিরচন)

(গ) (ফুলের / ফলের) ভারে নুয়ে পড়ে শীর্ণ তনু তার।

(ঘ) সূর্যকরে পাই যেন তার (স্বরের / করের) আলাপন।

(ঙ) তুচ্ছ করি (স্বর্গপুরী / ইন্দ্রপুরী) নন্দন-কানন।

২। **প্রতিশব্দ (৫টি) করে লেখ ঃ**

তনু, সূর্য, কর, সমীরণ।

১৩। রামগরুড়ের ছানা

সুকুমার রায়

কবি-পরিচিতি ঃ সুকুমার রায় (১২৯৪-১৩৩০ বঙ্গাব্দ) একজন প্রসিদ্ধ শিশু সাহিত্যিক। জন্মস্থান ময়মনসিংহ জেলার মাশুয়া গ্রাম। পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়। হ-য-ব-র-ল, পাগলা দাশু, আবোলতাবোল প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার রচিত।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। **শূন্যস্থানে কবিতার কথা বসাও ঃ**

(ক) ঘুম নাই তার —— আপনি ব'কে ব'কে
—— কয়, "হাসিস যদি
—— কিন্তু তোকে !"

(খ) সোয়াস্তি নেই —— কোণে কোণে
বাধা উঠেছে কেঁপে
কান পেতে তাই ——।

২। **ভুল সংশোধন করে লেখ ঃ**

(ক) সদাই ঘরে ত্রাসে—	ঐ বুঝি কেউ আসে !
(খ) ঝোপের ধারে ধারে	দিন আলো পরে
(গ) হাসতে হাসতে যারা	যাচ্ছে কেবল মারা
(ঘ) রামগরুড়ের বাসা	কুলুপ দিয়ে ঠাসা

১৪। ছড়া

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কবি-পরিচিতি ঃ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) তিনি নদীয় জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের নিকটে হরিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং হইতে বি. ই. পাস করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং পেশা গ্রহণ করেন। তিনি অসাধারণ কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার রচিত কাব্য পুস্তকগুলির মধ্যে 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া, ত্রিযামা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। **ঠিক পরের লাইনটি লেখ ঃ**

(ক) কমলা দীঘির	জাংলা পাড়
(খ) শুশুনি কলমি	ল' ল' করে
(গ) চলেছে তিনকাল	পা পা হাঁটি
(ঘ) কাঁপছে কণ্ঠ	উঠছে ডাক
(ঙ) চলছে চলছে	গুটি গুটি

২। **'ওয়ালী' সহযোগে তিনটি শব্দ গঠন কর।**
(যেমন—শাক-ওয়ালী)

৩। **মিল দাও ঃ**
ডাক, গুটি, জল, ঘাড়, থুড়ি।

১৫। চন্দ্র সূর্য বন্দনা

পরশুরাম

কবি-পরিচিতি ঃ পরশুরাম ছদ্মনাম। ইহা সাহিত্যিক নাম। প্রকৃত নাম রাজশেখর বসু (১৮৮০—১৯৬০)। নদীয়া জেলার জন্ম। রসায়ন শাস্ত্রে এম্. এ. দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

কর্মজীবনে পরশুরাম বেঙ্গল কেমিক্যাল নামক বিরাট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সাহিত্য সাধনা ও রসবোধের জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাঁহার রচিত রসরচনা 'গড্ডলিকা' তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। 'মহাভারত', 'রামায়ণ' সংক্ষিপ্তাকারে লিখিয়া এবং 'চলন্তিকা' নামক অভিধান সংকলন করিয়া তিনি তাঁহার মনস্বিতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার আরও অনেক পুস্তক আছে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। যে কথাটি ঠিক সেটি নিয়ে খাতায় বাক্যগুলো পুনরায় লেখ ঃ

(ক) চাঁদ (পরোপকারী/ক্ষতকারক) ভদ্রলোক।
(খ) সূর্য (দেবতাটি/মহাশয়টি) মহা ঝাঁকিদার।
(গ) জ্যোৎস্নায় (আমসত্ত্ব শুকোয়/ফুল ফোটে)।
(ঘ) কাঠফাটা রোদে শুকোয় (চর্ম/মলয়)।

২। বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ

নমস্কার, চৌপর, পরোপকারী, যথাসাধ্য, ভরদিন, কাঠফাটা রোদ্দুর, বিধাতার।

১৬। গাহি তাহাদেরি গান

কাজী নজরুল ইসলাম

কবি-পরিচিতি ঃ কাজী নজরুল ইসলাম একজন প্রসিদ্ধ কবি। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে বর্ধমানে চুরুলিয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার সম্পাদিত 'নবযুগ', 'ধূমকেতু', 'লাঙ্গল' প্রভৃতি পত্রিকা রাজরোষে পড়িয়া অকালে বন্ধ হইয়া

যায়। তিনি 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট', 'ব্যথার দান', 'বাঁধনহারা', 'আলেয়া' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। 'গাহি তাহাদের গান'—কাহাদের ?
২। কে 'রাতে উড়িল আকাশ-যানে' ?
৩। কে 'অসীমের পথচারী' ?
৪। কবি কাদের প্রণাম জানাতে এসেছেন ?
৫। **শূন্যস্থানে কবিতার কথা বসাও :**
(ক) দুস্তর পারাবারে যে —— একাকী ভাসালো ——,
(খ) —— মুছি আর রচি —— আমি আজিও নিশীথে জাগি,
(গ) ——গর্ভে, —— নভে, —— জুড়ে
(ঘ) যাহারা—— মেঘ-কন্যারে করিয়াছে ——।
৬। **প্রতিশব্দ বল (তিনটি করে) :**
আঁখি, আকাশ, সাগর, মেঘ, পবন।

১৭। স্বপ্নের সাধ করে আর ঝরে

জীবনানন্দ দাশ

কবি-পরিচিতি : জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯—১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) রবীন্দ্রনাথ যুগের অন্যতম বিশিষ্ট কবি। পূর্ববঙ্গে তাঁহার নিবাস ছিল। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বহু পঠিত কাব্যগ্রন্থ—'বনলতা সেন'। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'মহাপৃথিবী', 'রূপসী বাংলা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। **কোনটি করে প্রতিশব্দ গুছিয়ে লেখ :**

নদী	নক্ষত্র	পৃথিবী	অম্বু
তারকা	তটিনী	তারা	জল
ধরিত্রী	প্রবাহিণী	খদ্যোত	জীবন

২। দেবী লক্ষ্মীর বাহন—পেঁচা ; তেমনি নীচের দেব-দেবীর বাহন লেখ :
শিব, দুর্গা, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ।

১৮। আদর কর বাঁদরকে

অন্নদাশঙ্কর রায়

কবি-পরিচিতি ঃ অন্নদাশঙ্কর রায় একজন বিখ্যাত কবি ও ঔপন্যাসিক। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ ওড়িশার ঢেনকানলে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম হন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হন ও ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে জেলা জজ হন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন। 'পথে প্রবাসে', 'সত্যাসত্য', 'বিনুর বই' 'ইসারা', 'জাপানে' প্রভৃতি তাঁহার রচিত উল্লেখযোগ্য বই।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। **কবিতার কথায় মিল দাও ঃ**
দাদা, দিদি, বাবা, খুকু।

২। **কে কাকে আদর করবে বলে কবিতার উল্লেখ আছে ?**

৩। **শূন্যস্থানে কবিতার কথা বসাও ঃ**

(ক) আদর করবে দাদা।
... ...
কাঁচকলা আর আদা।

(খ) আদর করবে মা।
... ...
একটি শুনবে না।

১৯। সাধু

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কবি-পরিচিতি ঃ ইনি বর্তমানে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। এঁর লেখা 'সাগর থেকে ফেরা' রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের সম্মান এনে দিয়েছে। আজও তিনি বঙ্গসাহিত্যকে সেবা করে চলেছেন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। জল, জ্বালা ; বাজ, বাজা ; বুড়ো, বড় ; তাড়া, ত্বরা—কথাগুলোর অর্থ লেখ এবং কথাগুলো দিয়ে এক একটি বাক্য রচনা কর।

২। **পরের লাইনটি লেখ :**

(ক) জল নেই আর জ্বালাও নেইকো

(খ) পাহাড়ের গায়ে মঠের চূড়োটা ছাড়িয়ে

(গ) পাথুরে সিঁড়ির ধারে বসে থাকে

(ঘ) কেউ যদি তারে শুধায় কখনো

২০। বারো মাসের ছড়া

বুদ্ধদেব বসু

কবি-পরিচিতি : বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮—১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। কুমিল্লায় জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ. পাস করিয়া তিনি কলিকাতায় অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কম্প্যারেটিভ লিটারেচার'-এর অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। কবিতা লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ তিনি সারা জীবন করিয়া গিয়াছেন। 'কবিতা' নামে একটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেন। তিনি উপন্যাস রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি কল্লোল যুগের অন্যতম কবি। 'বন্দীর বন্দনা' লইয়া তিনি কাব্যজগতে প্রবেশ করেন। 'যেদিন ফুটলো কমল', 'একদা তুমি প্রিয়ে', 'তিথিডোর' ইত্যাদি তাঁহার রচিত উপন্যাস।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। **ঠিক পরের লাইনটি লেখ :**

(ক) আষাঢ় আঁধার হয়ে আকাশে ছড়ায়

(খ) ভাদ্রের মুখে হাসি, চোখে তবু জল

(গ) রৌদ্রের রুপো হলো সোনা একদিন

(ঘ) আজ কেন সব-কিছু লাগছে নতুন ?

২। (ক) সূর্য অস্ত যেতে করে না-তো ত্বরা—কোন মাসে ?
(খ) জুঁই ফুল ফোটে কোন মাসে ?
(গ) কোন মাস পুজোর গন্ধ নিয়ে আসে ?
(ঘ) কোন মাসে আম্রের মুকুল দেখা যায় ?
(ঙ) কাঁচা আম কোন মাসের আগমন আশ্বাস আনে ?

২১। কতো বার এলো কতো না দস্যু

কবি বিষ্ণু দে

কবি-পরিচিতি : শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে (১৯০১) কর্মজীবনে অধ্যাপক ছিলেন। আধুনিক যুগের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকৃত। তাঁহার রচিত ও প্রকাশিত সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস'। 'চোরাবালি', 'পূর্বলেখ', 'সন্দীপের চর', 'অন্বিষ্ট', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' ইত্যাদি তাঁহার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। তাঁহার কাব্য-প্রতিভার স্বীকৃতিরূপে তাঁহাকে লক্ষ টাকার জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে ধন্য করা হয়। কিছুদিন হলো তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

ভুল কথা সংশোধন করে কবিতাটি পুনরায় লেখ :

কতোবার এল কতো না দস্যু

কতবার এল কতো না মনীষী
কতো না বার
ঠগে ঠগে হল আমাদের কতো
গ্রাম আশীষী
কত বুলবুলি খেল কতো তেলাকুচু ফল
কতো মা গাইল বর্ষার গান
তবু বেঁচে থাকে অমর আত্মা
এ লোকের—
গোয়ালা, জেলে, মাঝি, কামার
তাঁতি আর ভিখারীর।

২২। আরও ভালো এক ছবি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কবি-পরিচিতি ঃ শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯) কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি কবিতা লিখিয়া বিখ্যাত হন। তিনি 'লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে' কাব্যজগতে প্রবেশ করেন। 'পদাতিক' তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। তাঁহার অনেক কবিতার বই আছে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। **অল্প কথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) এখনও আকাশ সূর্যের রঙে কি নয়?

(খ) শিয়রে দাঁড়িয়ে থাবা তুলে আছে কে?

(গ) মনকে কবি কি রঙে এঁকে দিতে বলেছেন?

(ঘ) কে কোথায় হামাগুড়ি দেয়?

২। **কোন পদ ঠিক কর ঃ**

ব্যথা, সাধ, কাঁদে, রাঙা, তবু, মদমত্ত, তাজা, যার।

২৩। আমাদের ডাক এসেছে

সুকান্ত ভট্টাচার্য

কবি-পরিচিতি ঃ সুকান্ত ভট্টাচার্য (৩০শে শ্রাবণ, ১৩৩৩—২৯শে বৈশাখ, ১৩৫৪) একজন বিখ্যাত কবি। ইংলণ্ডের বালক কবি চাটার্টনের মত তাঁহার কবিতাতেও বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল। তাঁহার রচিত 'ছাড়পত্র' কবিতাগুচ্ছ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। **যে কথাটি ঠিক তার পাশে দাগ দাও ঃ**

(ক) এবার পথে (চলতে/যেতে) হবে

(খ) ডাক দিয়েছে (চন্দ্রিম/গগন-রবি)

(গ) পথের (লোক/সাথী) আমরা রবির

(ঘ) ঘুম থেকে আজ (সাঁঝবেলা/সকালবেলা) ওঠরে।

(ঙ) পিছন পানে তাকাসনি আজ চল (সমুখে/পিছনে)

২। যে প্রতিশব্দগুলি ভুল সেগুলি কেটে দাও ঃ

(ক) রবি—তপন, সুধাকর, দিনমণি, সূর্য, ব্রহ্মাণ্ড।

(খ) গগন—মেঘ, আকাশ, শূন্য, অম্বর, জলদ, পয়োধি।

(গ) বিশ্ব—ব্রহ্মাণ্ড, দুনিয়া, রত্নাকর, মৃত্তিকা, ভূমণ্ডল।

—সমাপ্ত—